KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M T AMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication: ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection: KLMLGK	Publisher: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title: সমকালীন (SAMAKALIN)	Size: 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol & Number: ২১/- ২১/- ২১/- ২১/- ২১/-	Year of Publication: জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ || June 1973 আষাঢ় ১৩৮০ || July 1973 ভাদ্র ১৩৮০ || Sep 1973 কার্তিক ১৩৮০ || Nov 1973 অগ্রহায়ণ ১৩৮০ || Dec 1973
	Condition: Brittle / Good
Editor: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমকালীন

একবিংশ বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৮০

Corrected
12/11/73

আপনার মেয়ের
ভবিষ্যৎ আপনারই হাতে

আপনি সঞ্চয় শুরু করুন—ওর ভাবী জীবন সুখের ও আনন্দের ক'রে তুলতে পারবেন।

আমাদের এখানে কারেন্ট, সেভিংস, ফিক্সড ও রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খুলে সঞ্চয়ের সব রকম সুবিধেই পাবেন।

ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক

হেড অফিস : কলিকাতা

UCO-3/73

একবিংশ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ম কার্তিক তেরশ' আশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

হাসাহাসি ॥ মানসী দাশগুপ্ত ৩১৭

আঠারো শতকে মেদিনীপুর ও সাহিত্যসাধনা ॥ প্রণব রায় ৩২১

সার্ত্রে : স্বাধিকার ॥ সলীল বিশ্বাস ৩২৬

নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ ॥ গোরাচাঁদ মিত্র ৩৩১

কাঁধির করণ সমাজ ॥ পূর্ণচন্দ্র দাস ৩৪০

আলোচনা : আন্তর্জাতিক আইনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ॥ সুখরঞ্জন চক্রবর্তী ৩৫১

সমালোচনা : কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্মরণিকা ॥ কবি নবেন্দ্র দেব স্মরণিকা ॥ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৫৬

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

১০,০০০ জীবন—প্রতি বছরে পথের বলি
আপনার জীবন বিপন্ন করবেন না। এই

ডানলপ নির্দেশিকা
মন দিয়ে পড়ুন

ভাবতে অবাক লাগে প্রতি বছর দুর্ঘটনায় আমাদের দেশের রাজপথে ১০,০০০ এর বেশী লোকের মৃত্যু হয়। যাঁরা আহত হন তাঁদের সংখ্যা ৫০,০০০ এর বেশী। অথচ দৈবের ওপর সবটা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা যায় না। কেননা দুর্ঘটনার কারণ, হয় গাড়ির চালক না হয় পথচারী। দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলার জন্যে নিচে লেখা কয়েকটা সহজ নিয়ম মেনে চলুন :—

এই লাইন বরাবর কাটুন

পথচারীদের জন্য

১। মনে রাখবেন ট্রাফিক সিগন্যাল শুধুই গাড়ির জন্যে নয়, পথচারীদের জন্যেও। ভাল করে সিগন্যাল দেখুন।
২। পেভমেন্ট কিংবা ফুটপাথ থাকলে, তার উপর দিয়ে হাঁটুন। ফুটপাথ না থাকলে রাস্তার ডান দিক ধরে হাঁটাই নিরাপদ—উল্টো দিক থেকে যেসব গাড়ি আসছে সেগুলো দেখতে পাবেন।
৩। ভিড়ের রাস্তায় অনেকে মিলে পাশাপাশি হাঁটবেন না। এতে যানবাহনের অসুবিধা হয় এবং দুর্ঘটনায় আহত হবার আশঙ্কা থাকে।
৪। রাস্তার বাঁকে কিংবা এমন কোথাও দাঁড়াবেন না, উল্টো দিক থেকে আসা গাড়ির চালক যেখানে আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন না।
৫। 'জেব্রা' চিহ্নিত জায়গায় রাস্তা পারাপার করুন। প্রথমে ডানদিক, তারপর বাঁদিক এবং আবার ডানদিকে তাকিয়ে, পথ ফাঁকা দেখলে, চটপট রাস্তা পার হোন। ভয় পাবেন না, দৌড় লাগাবেন না, মাঝপথে গিয়ে মত পাল্টাবেন না।
৬। বাস কিংবা ট্রাম যখন চলছে, তখন ওঠানামা করবেন না।
৭। দাঁড়িয়ে থাকা কোনও গাড়িতে আপনার দৃষ্টি ব্যাহত হলে, আরও বেশী সতর্ক হোন। রাস্তা পরিষ্কার কিনা সেটা ভাল করে না জেনে কোনও গাড়ির পিছন থেকে হট করে এগিয়ে যাবেন না।
৮। কীভাবে রাস্তা চলতে হয় বাচ্চাদের শেখান। রাস্তায় তাদের খেলতে দেবেন না।
৯। পিচ্ছিল রাস্তা বিপজ্জনক, রাস্তায় ফলের খোসা ফেলবেন না।
১০। সৌজন্য আর করুণার পরিচয় দিন। বাসে ট্রামে আর রাস্তায় শিশু, বৃদ্ধ, অন্ধ আর পঙ্গুদের সাহায্য করুন।

মোটর গাড়ির জন্য

১। ট্রাফিক লাইন আর সিগন্যালের উপরে সতর্ক চোখ রাখুন। মনে রাখবেন, ট্রাফিক পুলিশ আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।
২। আপনার গাড়ি ভাল অবস্থায় আছে কিনা দেখুন। বিশেষ করে ব্রেক, স্টিয়ারিং, টায়ার এবং আলোর দিকে নজর রাখবেন।
৩। ওভারটেক করা কিংবা ডাইনে বাঁক নেবার প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত রাস্তার বাঁদিক ঘেঁষে চলুন।
৪। রাস্তায় ভিড় থাকলে খুব সাবধানে গাড়ি চালান। দাঁড়ানো কোনো গাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় খুব নজর রাখবেন, হঠাৎ কোনো পথচারী আপনার গাড়ির সামনে এসে পড়তে পারেন।
৫। চৌরাস্তায় একটু বেশী পরিমাণে সতর্ক থাকা চাই। ঠিকমত সিগন্যাল দিন। আপনার ডানদিকের যানবাহনের গাড়ি অবরোধ করবেন না, তাদের আগে যেতে দিন।
৬। ডানদিকে বাঁক নেবার সময় ঠিকমত গাড়ি ঘোরাবেন, নইলে বিপদ ঘটতে পারে।
৭। রাস্তার যে জায়গাটি পথচারীদের পারাপারের জন্যে চিহ্নিত সেখানে সতর্ক থাকুন, ট্রামের যাত্রীরা যেখানে ওঠানামা করছেন সেখানেও সতর্ক হওয়া চাই।
৮। নিজের কিংবা অন্যের বিপদ ঘটবে না, এমন বুঝলে তবেই ওভারটেক করবেন, নইলে নয়। একমাত্র ডানদিক দিয়ে ওভারটেক করবেন। তার আগে দেখে নিন, সামনের গাড়ির ড্রাইভার ডানদিকে মোড় নেবার সিগন্যাল দিচ্ছেন কিনা, সেক্ষেত্রে ওভারটেক করবেন না। কেউ যখন আপনাকে ওভারটেক করবে, তখন গতি বাড়াবেন না।
৯। ঠিক সময় আলো জ্বালুন, যেটুকু দরকার, তার চাইতে জোরালো আলো ফেলবেন না।
১০। এমনভাবে দরজা খুলুন, যাতে পথচারীদের ধাক্কা না লাগে, কিংবা অসুবিধে না হয়।

এই লাইন বরাবর কাটুন

রাজপথের নিরাপত্তা সম্পর্কে আরও জানতে হলে বিনামূল্যে প্রচারিত পুস্তিকা 'পথের বিধি'র জন্যে লিখুন : জনসংযোগ বিভাগ, ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ৭২এ, মীর্জা গালিব স্ট্রীট, কলিকাতা ১৬।

পথের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে
ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

কার্তিক
তেরশ' আশী

সমকালীন

একবিংশ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

হাসাহাসি

মানসী দাশগুপ্ত

হাসির কারণ নিয়ে একদা দার্শনিকেরা বহু ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। কেন হাসি, হাসি ব্যাপারটার তাৎপর্য কী এইসব নানা রকম কথা এ পাশ ও পাশ ফিরিয়ে দেখা হতো সে সব আলোচনায়। এ বিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও কথা বলতে শোনা গেছে। এই সব দিকপালদের মতামত পুনরুদ্ধার করা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, এঁদের বাণী এঁদের বচনেই সুখশ্রাব্য। এঁরা সকলে নিজ নিজ মত বলতে গিয়ে নানা কথা বলেছেন যার ভিতর দিয়ে একটি কথা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটি হলো যে রকম ব্যাখ্যা কান্না কিংবা খুশিতে দরকার নেই সেই রকম একটা ব্যাখ্যা কিন্তু হাসির জন্যে চাই। তার কারণ, হাসি একান্তই মানবিক দুর্বলতা, জীবজগতে কোথাও হাসি নেই। রাগ-ভয়-সুখ-দুঃখ সবই তার আছে, অথচ হাসির ব্যবস্থাটি নেই। মানব জগত থেকে জীবজগতের এই সামান্য ব্যতিক্রমকে ব্যাখ্যা না করলেই নয়, দার্শনিকেরা তাই উঠেপড়ে লেগে গিয়েছিলেন। খুশির সঙ্গে হাসির তফাৎ এরা অনেকেই পেয়েছেন, অনেকে যা দেখেননি—কিংবা দেখতে পেলেও বলেননি তা হলো এই যে মানবিক জগতে হাসির গতি সর্বত্র অবারিত নয়। তিন মাসের শিশু এবং অতি বৃদ্ধ উচ্চহাস্য করে না। ঐ বয়সের সীমায় সুড়সুড়ি দিলেও মানুষের শরীরে অস্বস্তি দেখা যায় মাত্র, হাসি বেরোয় না। হাসির প্রকোপ তারুণ্যে প্রবল, যৌবনেও এর উপদ্রব দেখা যায়, ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে এর প্রাবল্য কমে আসে। এ ব্যাপারে অবশ্য পাত্রভেদে প্রতিক্রিয়াভেদ দেখা যায়। সাধারণভাবে দেখা যায় বালক ও তরুণদের চেয়ে বালিকা ও তরুণীগণ হাস্যে অধিকতর আন্দোলিত হন। বোকাদের চেয়ে বুদ্ধিমানেরা বেশি হাসেন কিনা এ প্রশ্নের তৈরি জবাব অবশ্য এখনি দেওয়া যাচ্ছে না, কেন না এটি পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ করে দেখা হয়নি এখনো। তা ছাড়া, পৌনঃপুন্যতার হিসেবে

বোকাদের বেশিবার হাসতে দেখা যায় এরকম একটা সাক্ষ্য প্রমাণ যদি মেলেও, সেই এক সাক্ষ্যেই বলে, মিহি রসিকতার আদত হাসি হাসে বুদ্ধিমান—এসব কথায় আবার হাসির জাত বিচারে অন্য বিবেচনা এসে যায়। এসব কথায় কান দেবার পূর্বে সকল প্রকার হাসির নমুনা যত্নপূর্বক সংগ্রহ করা দরকার। সে কাজের ভার অবশ্য গুরুতর হবে, কেন না হাসির যে মূল্য মানব প্রকৃতিতে রয়েছে তাকে লঘু করে ফেলবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। ভাষার মতোই মানবিক স্তরে হাসির আবির্ভাবের এক গূঢ় অর্থ আছে, যা এখনো কেউ সম্পূর্ণ ভেদ করে ফেলতে পারেনি।

হাসি যে বয়সে সুরু আর যে বয়সে নিশ্চিত শেষ এ দুই বয়সের সামান্য লক্ষণ লক্ষ্য করলে হাসির প্রাদুর্ভাবের কতকটা সঙ্গত ব্যাখ্যা মেলা সম্ভব। এইদিকে আমার পর্যবেক্ষণ প্রয়াস কতটা সাফল্য পেয়েছিল, একটি দুটি শিশুর হাস্যবেগের ক্রমবিবর্তন আমি খুব কাছে থেকে নিরীক্ষণ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। একটির বর্ণনা দেয়া যাক।

প্রথম হাসলো আজ—শব্দ করে—অ—র হাসিমুখ দেখে, তারপরে দেয়ালে ক্যালেণ্ডারে নৃত্যরতা মেয়ের রঙীন ছবিকে কাঁপতে দেখে হাসলো আবার। যতবার ঘুরতে ফিরতে সেই ক্যালেণ্ডার চোখে পড়ছে, হেসে উঠছে শব্দ করে আপন মনে। কোলে করে ক্যালেণ্ডারের কাছে নিয়ে গেলে হাসি নেই। হাত ধরে নিজে নাড়তে পেলো যেদিন থেকে ছবিটাকে, দেয়ালে দূর থেকে দেখলেও আর হাসলো না তারপরে।···হেসে ওঠা এখন কেবল মানুষের মুখের হাসি কিংবা খেলার উপরেই নির্ভর করছে।

এ বর্ণনাকে সম্পূর্ণ করতে এর সঙ্গে আরো অনেক তথ্য জুড়তে হবে, যথা এই হাসির আবির্ভাব শিশুর বহির্জগত চেতনার কোন স্তরে এলো, নিজের আঙুল ধরা আর কারো চটিজুতো চেপে ধরা প্রভেদ তার কাছে কতটুকু স্পষ্ট। এর অন্যদিকে রাখতে হবে সেই জাতকের বর্ণনা যে প্রৌঢ়কাল অবধি কতকাংশে নিজের স্বভাবী হাসির বেগ বইয়ে দিতে পেরেছে। তার হাসি কেমন করে কখন সম্পূর্ণ মুছে গেল এর রেখাচিত্র ধরতে পারলে নিশ্চয় দেখতে পাওয়া যাবে জাতকের হাসি কী ভাবে কাছের থেকে দূরের মানুষে ব্যাপ্ত হচ্ছে, তারপরে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে সে-হাসি একেবারে ভুলে যাওয়া প্রতিক্রিয়ার স্তরে। আমাদের প্রত্যেকের সীমিত অভিজ্ঞতায় এ ক্রমাবলুপ্তি ধরা পড়ে। কিশোর খেলার অবসানের অসংখ্য লক্ষণের ভিতরে হাসতে ভুলে যাওয়া একটি, চেয়ে দেখতে চাই না বলেই এটি আমরা লক্ষ্য করি না, আস্তে আস্তে হাসির সূত্র ছিড়ে যায়। এ সূত্র অপরের সক্রিয় সান্নিধ্যের সূত্র,—সেই সান্নিধ্যে আমাদের কৌতুক। জাতকের সঙ্গে মানবজগতের যোগ শুধু প্রয়োজনে নয় কৌতুকে।

অপরকে অপর বলে যখন প্রথম জানা যায়, এ জ্ঞান যতদিন থাকে, সেই একই কাল অপরের ব্যবহার যে নিজের শক্তির গণ্ডীর ভিতরে নাই এ বোধ যখন আসে এবং যতদিন রয়ে যায়, তখন এবং ততদিন আয়ত্তের অতীত সেই অপরের গতিবিধিতে জাতকের হাসি পায়। অপরের গতিবিধি যে কোনো মুহূর্তে হাস্যকরতার পর্যায় পার হয়ে ভয়াবহ, শোকাবহ, কিংবা ক্রোধের কারণ হয়ে উঠতে পারে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, যতক্ষণ অপরের চলমান ব্যবহারের নিজ প্রয়োজনমতো সুখ-দুঃখ রাগ দ্বেষ ভয় ভালবাসার বাঞ্ছনায় ব্যাখ্যা না মিলেছে, ততক্ষণ তাদের দেখলে জাতকের হাসি পায়।

জীবজগতে হাসি নেই কেন না জীবজগতে এই অপর-প্রত্যক্ষ মানবিক চেতনার অনুরূপ বোধে উদ্ভাসিত নয়। জীবজগতে অপর জীবের স্বার্থ বন্ধনে বিন্যস্ত, অপর তাকে ভক্ষণ করে, আর নয়তো তার ভক্ষ্য হয়, আঘাত করে নতুবা আহত হয়, ব্যবহার করে অথবা ব্যবহৃত হয়, প্রয়োজন সাধনের বিন্যাসে জীব ও তার পরিপার্শ্ব পরস্পর বিন্যস্ত, তার বাইরে অপর তার কাছে অর্থহীন, অবান্তর। মানুষের জীবনে প্রাসঙ্গিকতার এমন পূর্বনির্ধারিত নয়, অপরের সীমা তাকে নিজেকে আবিষ্কার করে নিতে হয়, সেই আবিষ্কারের পদ্ধতিতে অপর প্রতিটি জাতকের কাছে বিশিষ্ট রূপ ধরে। অপরের উপর শক্তি বা প্রভাব বিস্তার করা যে জাতকের পক্ষে যতো কঠিন, তার তত হাসির মাত্রা বাড়ে। কেন না অপরের কর্মকাণ্ড সবই তার আয়ত্তের বাইরে, দুধু ভালো করে দেখে বুঝে নিতে না নিতে তা বদলে যেতে থাকে, 'ওরে থাম থাম' বলে সে হেসে আকুল হয়ে যায়, এই হাসি শিশুর খেলার হাসি। এ খেলা বেশিদিন সম্পূর্ণত খেলা থাকে না, অপরের গতিপ্রকৃতি ধীরে ধীরে অনেকখানি অর্থবহ হয়ে ওঠে। আর অর্থ যেই আসে অমনি ভালো আর মন্দ লাগার অনর্থ সুরু হয়ে যায়, অর্থহীন কৌতুক বিদায় নিয়ে যায় জাতকের কাছ থেকে। তবু, বারে বারে নতুন মানুষ তথা নবীন অপর দেখা দেয় জাতকের জীবনে, সেই সঙ্গে দেখা দেয় কৌতুকের নব সম্ভাবনা, এমনি করে শিশু বড় হয়ে ওঠে যতদিন না শেষ পর্যন্ত সে বার্ধক্যে উপনীত হয়—নতুন আর নতুন লাগে না, অপরে আর নিজেতে ভেদের রেখা নিত্য ব্যবহারে যখন বহুল ব্যবহারে মোটা হয়ে আসে,—কোনো সূক্ষ্মতা যেখানে আপন চিহ্ন ফেলতে পারে না। অপর তখন শুধু প্রয়োজন, আর প্রয়োজন তখন বিভীষিকা। হাস্য সেখানে অশ্রুতপূর্ব শব্দের মতো বিভ্রান্তিকর।

উচ্চহাস্যের এ গতি কি কেবল জাতকের উপর দিয়ে বয়ে যায়, জাতক কি উচ্চহাস্যকে ব্যবহার করে না? করে, আর সেইজন্যই সুরুতে যা থাকে স্বতঃস্ফূর্ত হাসি, তা রূপান্তরিত হয়ে যায় হাসাহাসিতে। হাসাহাসি নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যা অপরের সান্নিধ্যে ও সহযোগিতায় প্রস্তুত। হাসাহাসির জন্য হাসি এলো বলে হেসে ফেলার বদলে কাজে লাগানোর জন্যে হাসি তৈরী করে নিতে হয়। সম্পূর্ণ হিসেব করে তৈরি হলে সে হাসিকে কাঁহাহাসি বলে চিনে নেওয়া যায়, কিন্তু অর্ধচেতনার মিশ্রণে প্রস্তুত ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহারযোগ্য হাসিকে স্বভাবী উচ্চহাস্য থেকে সহসা তফাৎ করা যায় না।

হাসি দিয়ে অপরকে ঘায়েল করা যায়—সমাজের এই আবিষ্কারের মূল্য অপরিসীম। হাসির এ আয়ুধ চরিত্র এক অসাধারণ বোধ আবিষ্কার। অপরের দিকে তাকিয়ে উচ্চহাস্য করলে তার ফল কী দাঁড়ায় তা আমাদের মোটামুটি সকলেরই জানা আছে এবং এ জ্ঞান আমরা সকলেই সামাজিক পরিবেশে লাভ করেছি। ঠিক কোন বয়সে হাসাহাসি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়-এ বিষয়ে সামাজিক বীক্ষার সম্ভাবনাকে গবেষকেরা এখনো কাজে লাগাননি। সাধারণভাবে দেখা যায় অপরের উপরে জাতকের এ কথা অস্পষ্টভাবে অনুভব করবার পর থেকে বালকবালিকারা হাসিকে এইভাবে ব্যবহার করবার চেষ্টা করে। বয়োবৃদ্ধি ও দক্ষতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাসাহাসির নৈপুণ্য ও সূক্ষ্মতা বাড়ে। সরাসরি উগ্রতা প্রকাশ ও অধিকার স্থাপন যেখানে অনুমোদিত, সেখানে হাসাহাসির ব্যবহার ক্রমে কমে আসে। এ অনুমোদন একদিকে সমাজবিন্যাসের উপর যেমন নির্ভরশীল, তেমনি নির্ভরশীল

শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের উপরে। প্রতি পক্ষকে যুক্তিসহ তর্কে কিংবা গায়ের জোরে কাবু করবার আশা যার মনে যত অনুজ্জ্বল, সে ততো হাসাহাসি করে প্রতি পক্ষকে নস্যাৎ করে দিতে চায়। মেয়েদের হাসাহাসি করবার অভ্যাস যে সহজে মরতে চায় না, এটি তার কারণ হতে পারে। অপরদিকে, সাধু অথবা সাধ্বীগণ—যাঁদের মহিমা সকল প্রশ্নের অতীত, চারিত্র্য মহিমাতেই যাঁরা সকল অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন—হাসাহাসি করবেন এমন কথা ভাবা যায় না।

প্রত্যক্ষ ক্ষমতা প্রাপ্তির সুযোগ এলে, অপরকে নিজের আয়ত্তাধীনে এনে ফেলা গেলে, হাসাহাসির বেগ সম্ভবত কমে যায়। বয়স যেমন বাড়ে, অপরের উপর প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা বেড়ে বেড়ে যায়, না বাড়লেও বাড়বার আশায় ক্ষমতা শানানোর চেষ্টা চলে। হাসাহাসির জোর কমে বাগবিতণ্ডা বাড়ে। যতদিনে এ চেষ্টার সারশূন্যতা ধরা পড়ে, জানা যায় কার প্রভাব কতদূর, তখন ব্যঙ্গ তিক্ত হয়ে গেছে, তখন হাসাহাসির জন্য অপরের সান্নিধ্য সন্ধানে ফিরবার সাধ্যও ফুরিয়ে এসেছে। হাসাহাসিতে যোগ দেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে পদে পদে হাসাহাসি থেমে যায়।

ক্ষমতা প্রভাব ইত্যাদির ছায়ায় হাসাহাসি কমে আসে এ কথা সম্ভবত সমাজ জীবনে সাধারণভাবে সত্য। নইলে দেশে দেশে অধুনা নতুন হাসির গল্পের এতো অনটন হবে কেন? অপরের উপরে ব্যক্তিগত প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ বেড়ে গিয়ে থাক চা-ই না থাক, বাড়বার সম্ভাবনা আছে এই বোধ, অপরকে ডিঙিয়ে যাবার প্রবল চেষ্টা এমন সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রতিক জাতকদের মন অধিকার করেছে, অন্যান্য আয়ুধ নিয়ে সৃজনশীল মানুষ এত চিন্তিত, ব্যস্ত, যে হাসির হাওয়া এদের আকাশে একেবারে পড়ে গেছে। মনকে মজার আকাশে উড়িয়ে দেবার সুযোগই মিলছে না আর কিছুতে।

আঠারো শতকে মেদিনীপুর ও সাহিত্যসাধনা

প্রণব রায়

সাহিত্যসাধনা সুনির্দিষ্ট কোন সীমারেখা বা গণ্ডীর আবর্তের মধ্যে আবদ্ধ না থাকলেও বিহার-উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী বর্তমান মেদিনীপুর জেলার একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে বিকাশ লাভ করেছিল তা বেশ বোঝা যায়। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার এই 'বিশেষ' অঞ্চলটি হ'লো উত্তরপূর্বাংশ যা একান্তভাবেই রাঢ়দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল এককালে। নিবিড় বনভূমি বেষ্টিত পশ্চিমাংশ (যা পূর্বে জঙ্গলমহাল নামে পরিচিত ছিল) এবং পূর্ব-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ যথাক্রমে বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত থাকায় এসব অঞ্চলে বাঙলা সাহিত্যের গতিপথ যে কিছুটা রুদ্ধ হয়ে থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য এই জেলার বেশির ভাগ অংশই উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত থাকায় উৎকলীয় সংস্কৃতির প্রভাব সাহিত্য ও শিল্পচর্চায় যে অবশ্যম্ভাবী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সুপ্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের পতনের পর থেকে (আনুমানিক দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগ) তাম্রলিপ্ত সহ মেদিনীপুরের সুবিস্তীর্ণ দক্ষিণাঞ্চল উৎকল বা উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজাদের অধীনে আসার পর থেকে এ অঞ্চলে স্থায়িভাবে উড়িষ্যার শাসন প্রবর্তিত হয় এবং তা ক্রমশ পশ্চিমাংশ বরাবর উত্তর দিকের কিছু অংশে বিস্তার লাভ করে। উড়িয়ারা এসব অঞ্চলে প্রায় সাড়ে চার শ বছর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।১ আফগানদের সময়ে এই জেলার উত্তরপূর্ব-ভূভাগের কিছু অংশ সরকার মান্দারণের এবং অবশিষ্টাংশ সরকার জলেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোগল বিজয়ের পরও মেদিনীপুর জেলার বেশির ভাগই উড়িষ্যা সুবার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ শুজার আমলে সরকার জলেশ্বরকে উড়িষ্যা থেকে বিচ্যুত করে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সরকার জলেশ্বর উড়িষ্যার অংশ বলেই পরিগণিত হতো। আকবরের রাজস্বসচিব তোডর মল্লের সময়ে বর্তমান মেদিনীপুরের বেশিরভাগই ছিল উড়িষ্যার পাঁচটি সরকারের অন্যতম জলেশ্বর সরকারের অন্তর্ভুক্ত এবং বাঙলার সরকার মান্দারনের ষোলটি মহালের মধ্যে চিতুয়া, সাহাপুর, মহিষাদল ও হাভেলি মান্দারুণ (চন্দ্রকোণা ও বরদা পরগণা ও হুগলী জেলার কিয়দাংশ) এই চারটি মহাল ছিল মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও মধ্যাংশ। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর মীরকাশিম ইংরেজদিগকে যে সনন্দ দেন তাতে মেদিনীপুরের বগড়ী, ব্রাহ্মণভূম, চন্দ্রকোণা, বরদা ও চিতুয়া এবং হুগলীর জাহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ) এবং হাওড়ার মণ্ডলঘাট, খারিজা মণ্ডলঘাট ও ভুরশুট পরগণা চাকলা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং চাকলা মেদিনীপুর বলতে তখন কাশীজোড়া প্রভৃতি চুয়ান্নটি পরগণা ছিল। পরে এসব পরগণার কিছু কিছু অন্য জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়।

এইভাবে সংযুক্তিকরণ ও পৃথকীকরণের মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সৃষ্টি হলেও কয়েক শতাব্দী ব্যাপী সাহিত্য সাধনায় রাঢ়ীয় প্রভাব যতখানি লক্ষ্য করা যায় উৎকলীয় প্রভাব তদনুপাতে নেই বললেই চলে। তার একটা কারণ বোধ হয় মধ্যযুগের কয়েকজন খ্যাতনামা কবির আবির্ভাব ঘটেছিল এই জেলার পূর্বোক্ত সরকার মান্দারনের অঞ্চল সমূহের মধ্যে, যেগুলি

উৎকলীয় সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত ছিল বরাবর। এইসব শক্তিশালী কবির প্রভাবে উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এই জেলার অবশিষ্টাংশের সাহিত্যচর্চা স্বাভাবিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত হতো বলে ভাষার মধ্যে ওড়িয়ার আধিপত্য একপ্রকার নেই বললেই চলে। প্রাচীন পুথিপত্র ভালোভাবে লক্ষ্য করলে সাহিত্যের ভাষার এই আশ্চর্য রকমের বিশুদ্ধতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (অবশ্য অল্প কিছু অংশে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়) মেদিনীপুর অঞ্চলের মধ্যযুগীয় কবিদের সাহিত্যিক ভাষা ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে গবেষণার বিষয় হলেও মোটামুটিভাবে দক্ষিণরাঢ়ে বহুল প্রচলিত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে যে বড়ো রকমের কোন পার্থক্য নজরে পড়ে না, তা বলা যায়। আজ পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে যে সব প্রাচীন পুথিপত্র পাওয়া গেছে সেগুলির বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। অতিসম্প্রতি চেতুয়ার দাসপুর অঞ্চলে প্রাচীন পুথির অনুসন্ধানকালে লেখক কর্তৃক প্রাপ্ত জগন্নাথ দাসের 'রাসপঞ্চাধ্যায়ের' (লিপিকাল ১১৭১ বঙ্গাব্দ) একটি পুথিতে বাঙলা-ওড়িয়ার মিশ্রণ-জাত এক ভাষা লক্ষ্য করা গেছে। এ ধরণের পুথি অনুসন্ধান করলে হয়ত আরও পাওয়া যেতে পারে। 'রাসপঞ্চাধ্যায়ের' এই পুথিটির মধ্যে কবির একটি ভণিতা হলো—

কৃষ্ণ হোইলা অন্তর্ধ্যান ॥ বোলই দাস জগন্নাথ।
বলে নিরোপি কৃষ্ণপদ্ম।

এ ধরণের পুথির মেদিনীপুরের চেতুয়া অঞ্চলে (যা পুরাপুরিভাবে রাঢ়দেশের অন্তর্বর্তী) যে পঠনপাঠন হতো, তা থেকে এ কথা বলা যেতে পারে যে উৎকলীয় ভাষার প্রভাব বাঙলায় অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাহিত্যের ভাষায় গৌড়ীয় প্রভাব এবং রীতিকেই মেনে নিতে হয়, যার সঙ্গে সমগ্র রাঢ়ের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন ছিল। এ বিষয়ে নিশ্চিত গবেষণা সাপেক্ষে সাহিত্যসম্পর্কে এ কথাটা মোটামুটি বলা যেতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, মন্দিরস্থাপত্যভাস্কর্যে একটি উৎকলীয় শৈলী সুস্পষ্টরূপে বিকশিত হতে দেখা যায়। এ জেলার সীমান্ত বরাবর অঞ্চলসমূহে ও দক্ষিণাঞ্চলে, যার প্রভাব উত্তর-পূর্বাংশে বিশেষভাবে পড়েছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি উৎকলীয় শৈলীর সৃষ্টি হয়ই নি, বরং তা অনুপস্থিত ও গৌণই থেকে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভাষার সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভাষার (অবশ্য ধ্বনি ও উচ্চারণের দিক থেকে) এক সুস্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে!

মেদিনীপুর জেলার সাহিত্যসম্পর্কে এই কথাগুলি মনে রেখে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আর এটাও ঠিক সরকার মান্দারনের তথা পরবর্তিকালে চাকলা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত বর্তমান মেদিনীপুরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত মেদিনীপুর, ব্রাহ্মণভূম, চন্দ্রকোণা বাগড়ী, বরদা, চিতুয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যে খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা কবিদের আবির্ভাব হয়েছিল বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরাই স্থায়ী কীর্তির অধিকারী হয়েছিলেন। এঁদের কেউ কেউ এসব অঞ্চলে আদি বাসিন্দা ছিলেন না, যেমন, ষোল শতকের শেষদিকের খ্যাতনামা কবি মুকুন্দরাম, ব্রাহ্মণভূমের আরড়াগড়ে এসেছিলেন বর্ধমান জেলার দামুন্যা থেকে, আঠারো শতকের গোড়ার দিকের কবি রামেশ্বর এসেছিলেন কর্ণগড়ে বরদা পরগণার যদুপুর থেকে।

ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যেমন সাহিত্যসাধনা সীমাবদ্ধ থাকে না, তেমনি সাহিত্যকে কোন যুগের এক বিশেষ আবর্তেও ফেলা যায় না। বস্তুত পক্ষে, আঠারো বা উনিশ শতকীয় সাহিত্য

শুধুমাত্র কাল্পনিক বিভাগ মাত্র। ধর্মীয়, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে সমাজের সার্বিক চিরাচরিত অবস্থার পরিবর্তনে সাহিত্য, শিল্পের মধ্যে নতুন ভাবধারার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায় কোন বিশেষ কাল বা যুগে। এর ফলে পরিবর্তন একটা হয় এবং তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় সমৃদ্ধির পথে, যেমন ষোল শতকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙলা সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল। সতেরো আঠারো শতকে তারই অনুস্মৃতি। উনিশ শতকে ইংরেজ সাহচর্যে সাহিত্যে নবযুগ লক্ষ্য করা যায় এবং আধুনিক সাহিত্যে এর পর কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হয় নি।

আঠারো শতকের সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য। কারণ, শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে প্রভাবিত চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যের গতিপথ এক নতুনদিকে প্রবাহিত হ'লো এবং সেই প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন গতিতে বয়ে চললো আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত। এর মধ্যে শক্তিশালী অনেক কবির আবির্ভাব হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের সকলের শক্তির উৎসমুখ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ষোল সতেরো শতকের সন্ধিক্ষণে বা তার কিছু আগে, যার প্রবাহপথ ধরে পরবর্তীকালের সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছে।

বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগ শেষ হয় আঠারো শতকে। মুদ্রণ যন্ত্রের সাহায্যে বাঙলা অক্ষরে হালহেডের বাঙলা ব্যাকরণ ছাপা হল ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। বাঙলা গদ্যে আইনের বই ছাপা হল ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। এর পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কেরি-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশন ও মিশন প্রেস স্থাপিত হল। প্রাচীন পুথিপত্র আস্তে আস্তে বিদায় নিতে লাগলো আর তার সঙ্গে বিদায় নিলেন মধ্যযুগের কবিরা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আঠারো শতকীয় সাহিত্য সাধনা কয়েকটি দিক দিয়ে উল্লেখ-যোগ্য। এক, অশান্তি-বিদ্রোহের মধ্যে এ শতকের শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত একটানা অরাজকতার মধ্যে এ শতকের সাহিত্যসাধনা অবিচ্ছিন্ন গতিতে চলেছিল। দুই, মঙ্গলকাব্যধারার অন্যতম দুটি ভাগ শিবমঙ্গল ও শীতলামঙ্গলের অভাবনীয় উন্নতি যা মেদিনীপুর জেলার কয়েকজন কবি করেছিলেন। রামেশ্বর ও নিত্যানন্দ ছাড়া শীতলামঙ্গল কাব্যধারার অনেক কবিই এ ধরণের কাব্যে তাঁদের উৎকর্ষ দেখিয়েছেন, যেমন চেতুয়া পরগণার কলাইকুণ্ডা গ্রামের কবি শঙ্কর দে এবং এই পরগণার কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।

মেদিনীপুর জেলার আঠারো শতকের বাঙলা সাহিত্য বলতে যদি কিছু বোঝায় তাহলে বোধ হয় এই জেলার চেতুয়া ও বরদা পরগণাই মুখ্য স্থান অধিকার ক'রে আছে। উপযুক্ত রাজা বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই দুই পরগণার অনেক কবির ভাগ্যে খ্যাতি হয়তো জুটে নি, কিন্তু কালের করাল হস্তক্ষেপ ছাড়িয়ে এসব কবির যে সব পুথি আজ আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করলে সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও তা থেকে এ অঞ্চলের অনেক কথা জানা যেতে পারে। 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি'র গত বৎসর সংখ্যায় ('মেদিনীপুরের আঠারো শতকের সাহিত্য' নিবন্ধে, পৃঃ ৭২-৭৮) এ শতকের যেসব কবির নাম উল্লেখ করেছি তাছাড়া আরও কয়েকজন শক্তিশালী কবির পুথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব কবির নাম ও পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হোল—

(১) শঙ্কর দে : ১১৪৪ বঙ্গাব্দে 'শীতলামঙ্গলে'র লঙ্কাপুজাপালা রচনা করেন। আদিনিবাস ছিল চেতুয়া পরগণায় কংসাবতী তীরে পশ্চিম মালিকাগ্রামে। পরে কবি বর্তমান দাসপুর থানার

কলাইকুণ্ডা গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। এ গ্রামটিও চেতুয়া পরগণায় অবস্থিত। কবির পিতার নাম কৃষ্ণদাস ও মাতার নাম মাধবী। কবি শঙ্করের 'শীতলামঙ্গলে'র চারখানি পালা ছাড়াও দিগ্‌বন্দনা, পঞ্চাননের গান, গঙ্গামঙ্গল, কামাক্ষার গীত, ফেত্রাবার পালার পুথিও আবিষ্কৃত হয়েছে।(২) 'শীতলামঙ্গল' কাব্যের জন্যেই কবি ঐ অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি সে সময়ে হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত কুলিয়া গ্রামের জমিদার ঠাকুর দাস চৌধুরীর আনুকূল্য লাভ করেছিলেন।

(২) **শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর :** চেতুয়া পরগণার অন্তর্গত ক্ষেপুতের নিকটবর্তী হাড়োয়াচক গ্রামে কবির বাস ছিল। পরে ক্ষেপুত গ্রামের কাছাকাছি 'কিষ্টবাটী' গ্রামে এসে কবি বাস করেন। তিনি 'শীতলামঙ্গলে'র চারখানি পালা (লক্ষ্মীপূজা, বরুণপূজা, ইন্দ্রপূজা, রাবণপূজা) ছাড়াও কবি 'পঞ্চাননমঙ্গল', 'লক্ষ্মীচরিত্র'(৩), 'সত্যনারায়ণের সাতভাই দুঃখীর পালা' রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থে কবি স্বয়ং রচনাকাল উল্লেখ করেছেন ১১২৫ সাল। 'পঞ্চাননমঙ্গল সম্ভবত' ১১৮০ বঙ্গাব্দে রচিত হয়। পূর্বোক্ত কবি শঙ্করের মতো কৃষ্ণকিঙ্কর সম্ভবত হাওড়া জেলার আমতা থানার কুলিয়া গ্রামের জমিদার বাঞ্ছারাম চৌধুরীর আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। এছাড়া তাঁর কাব্যে বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের উল্লেখ আছে। কিঙ্করের কাব্যে সে যুগে ঐ অঞ্চলের অনেক ইতিহাস জানা যায়। (৪)

(৩) **শ্রীবল্লভ :** শীতলামঙ্গলের রচয়িতারূপে পরিচিত হলেও (চারটি পালা 'লবকুশের পালা' 'পাতালবর্গ', নন্দালয় বা 'গোকুলপালা', 'চন্দ্রকেতুপালা') তাঁর 'দক্ষিণরায় উপাখ্যান' নামে কাব্যের এক পুথি অতিসম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে।(৫) আত্মপরিচয়ে জানা যায় কবির পিতা শ্রীগোপাল মান্দারণ সরকারের অন্তর্গত বন্দিপুর গ্রামে বাস করলেও তাঁর পিতামহ অভিরাম থেকে উর্ধতন আরও দুই পুরুষ শ্রীলোচন ও শ্রীরঘুবল্লভ দীর্ঘকাল চেতুয়ায় বাস করেছিলেন।(৬) এছাড়া কবির আরও একটি পুথির নাম 'গঙ্গীমঙ্গল'। ডঃ সুকুমার সেনের মতে শ্রীবল্লভ আঠারো শতকের কবি।

(৪) **মাধবীলতা :** মহিলা কবি। সম্ভবত আঠারো শতকের শেষভাগে মেদিনীপুর জেলার কোন স্থানে আবির্ভূত হন। মাধবীলতার একটি পুথি বর্তমান লেখকের কাছে আছে। পুথির নাম 'সুবচনীর পালা'।(৭)

(৫) **দ্বিজ বাঞ্ছারাম :** বরদা অঞ্চল থেকে এই কবি রচিত অনেকগুলি পদ্য ও আদশ গোপনের অন্যতম খানাকুল কৃষ্ণনগরের অভিরাম গোঁসাই-এর কাহিনী অবলম্বন ক'রে 'গোপীনাথের কীর্তনে'র এক পাতার (দুই পৃষ্ঠায় লেখা) একটি পুথি লেখক কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন ক'রে বাঞ্ছারাম অনেকগুলি পদ্য ও রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বনে এক দীর্ঘ চৌতিশা রচনা করেন।(৮)

এছাড়া বরদা পরগণার কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী (১৮ শতকের প্রথম ভাগ থেকে শেষ) ও রামেশ্বর চক্রবর্তী (কর্ণগড়রাজসভা—সতেরো শতকের শেষ থেকে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ), কাশীজোড়ার নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ও অন্যান্য আরও কবিরা আঠারো শতকের কাব্যচর্চাকে গৌরবমণ্ডিত করেছিলেন। (এদের সম্পর্কে 'ইতিহাসও সংস্কৃতির' গত বৎসরের সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে)। আকৃতিক সীমারেখার কথা বাদ দিলে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বেলডিহাগ্রামের

(বেলটে) প্রসিদ্ধ কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলী ধর্মমঙ্গল রচনা করেন ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে। মাণিকগাঙ্গুলীর। একটি শীতলামঙ্গলও পাওয়া যায়।

---

১ Bengal District Gazetteers, Midnapure : L. S. S. O'malley—P 22

২ মূল পুথি দাসপুর হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীত্রিপুরা বসুর কাছে আছে।

৩ মূলপুথি—লেখককর্তৃক প্রাপ্ত। সম্পূর্ণ পত্রসংখ্যা ১—১৮, লিপিকাল ১২৪৭ সাল

৪ 'মঙ্গলকাব্যের এক বিস্মৃত কবি', 'সমকালীন'/জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯, পৃঃ ১০৪—১০৮ : ত্রিপুরা বসু

৫ মূল পুথি, ত্রিপুরা বসু কর্তৃক প্রাপ্ত

৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ১৯৬৫ সং, পৃঃ ৪৪৬—৪৪৭ : ডঃ সুকুমার সেন।

৭ 'প্রাচীন বাঙলার কয়েকজন অপরিচিত কবি', 'সমকালীন'/অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ পৃঃ ৩৯৩—৪০১ : প্রণব রায়

৮ ঐ ঐ

সার্ত্রেঃ স্বাধিকার

সলীল বিশ্বাস

সমাজের শুভাশ্রয়-পরিচিতি নির্ভর প্রতিটি মানুষই কি সামাজিক ?—এই বিতর্কিত প্রশ্নের প্রথম উন্মেষ মুহূর্ত থেকে বিতর্ক বেজে উঠলেও—মানুষের স্বাধিকার চেতনা এবং স্বীকৃতির প্রেক্ষিতে বিতর্ক আরও জটিল এবং ফেনিল।—একদিন মানুষ ছিল মুক্ত' এবং 'আজ তার হাতে এবং পায়ে'—যে নানান বাঁধন জড়িয়ে গেছে—তার সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা এবং মুক্তি প্রয়াসের ভেতর দিয়েই দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে এসেছে।—এবং সেই ঘনায়িত সংঘর্ষের আজও কোন অবসান নেই।

'ব্যক্তি'-মানুষের নির্মুক্ত স্বাধিকারের অপরিসীমতার স্বীকৃতির অনুকূলে শতাব্দী চিহ্নিত অনেক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অকপট সমর্থন প্রতিকূল প্রতিবাদের আঘাতে স্ব-ভিত কেঁপে উঠেছে। ইতিহাস—এই সাক্ষ্যের অনেক দলিল আমাদের হাতে তুলে দিতে পারে।

'মানুষের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ পাশবিক'—এই মতাদর্শের প্রতিবাদী বলছেন,—'ব্যক্তি স্বাধিকার যদি সীমা—চিহ্নিত এবং সামাজিক প্রভৃতি প্রবাহের প্রতি প্রতিশ্রুত না হয়—তা' হলে বিশ্ব-শৃংখলা বিনষ্ট হবে।'—'এমন কিছু পদ্ধতি আছে যার ওপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই,—অথচ সেই পদ্ধতি-ই সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করেছে'—বলে অজ্ঞেয়বাদীরা এই দুই প্রতিমুখীন শিবিরের মধ্যে আপাত সেতুবন্ধন রচনা করতে চেয়েছেন। অজ্ঞেয়বাদী পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক হাবার্ট স্পেনসার 'মানুষের দুর্জ্ঞেয়'-এই শক্তিকে 'Inscrutable Power in Nature'—বলে অভিহিত করেছেন।

ইমান্যুয়েল কাণ্ট-ই প্রথম ব্যক্তি-স্বাধিকারের অনুকূলে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তুলেছেন। 'মানুষ অনিবার্য-ই মুক্ত'—এই প্রাক ধারনার ওপরেই কাণ্টের স্বাধিকার চেতনার ভিত গেঁথে উঠেছে। যে পারিবেশিক অবস্থাতেই যদি ব্যক্তির নির্মুক্ত স্বাধিকার স্বীকৃত না হয়,—তা' হলে 'অন্যে'-র প্রতি তার কোন নৈতিক বা ব্যবহারিক দায়িত্ব থাকে না। 'ব্যক্তি' কোন যদি তার ইচ্ছাকৃত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারে তা হলে তার অনুসৃত কোন কার্যকলাপের জন্যে তাকে নিন্দা বা প্রশংসার কোন প্রশ্ন-ই ওঠে না। কারণ, যথার্থ অর্থে, তিনি যা করলেন,—তার জন্যে তিনি-ই সম্পূর্ণতঃ দায়ী নন। এ কথার অন্তরালে, 'ব্যক্তি'-র একচ্ছত্র ইচ্ছা এবং আনুভূতিক স্বাধিকার চেতনার কথাই ঘোষিত হয়। কিন্তু স্বাধিকার চেতনার অগ্নিদহনে ফরাসী বিপ্লবের স্রষ্টা-পুরুষ রুশোর দর্শনেও ব্যক্তি-স্বাধিকারের সীমা চিহ্নিত হয়েছে। তিনি বলছেন,—'কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-ই তার একক 'ইচ্ছা' নিয়ে বাঁচতে পারে না,—সমাজের চলমানতায় তা মিলিয়ে দিতে হয়। কারণ, সমাজের 'ইচ্ছা'-ই হলো সার্বজনীন এবং অবিভাজ্য। ব্যক্তি-বিশেষ তার 'একক ইচ্ছা'র তখনই স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা অর্জন করেন—যখন তিনি 'স্ব-ইচ্ছা'কে সমাজের 'সার্বজনীন ইচ্ছার'-ই অবিচ্ছিন্ন অংশের স্বশ্রদ্ধ-স্বীকৃতি স্বীকার করেন। ভাববাদী দার্শনিক হেগেল এবং অনন্য ব্যক্তিত্ব স্পিনোজাও এই সীমাবাদের স্বীকৃতি উচ্চারণ করেছেন।

মার্কসবাদী লৌকিকতায় ব্যক্তি-স্বাধিকারের নির্মুক্ত স্বীকৃতি শ্রেণী-সংঘর্ষের প্রেক্ষাপট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। মার্কসবাদের মূল-গর্ব যদি 'স্বরাট' মানুষের প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিতে সংগ্রামী হয়, তাহলে 'অনিবার্যত মুক্ত' মানুষের স্বাধিকারের 'সীমা-চিহ্নিত'-মার্কসীয় বক্তব্যে—এই দ্বান্দ্বিক দর্শনের গর্ভে আর একটি 'দ্বন্দ্বের' প্রজন্ম ঘনিয়ে আসে। মার্কসবাদীরা বলছেন, 'অপরিহার্য বিস্ফোরণের যন্ত্রণা' থেকেই মার্কসবাদ স্বাধিকারের সীমা বেঁধে দিতে চায়। এ প্রসঙ্গে একটি সাধারণ কথা মনে আসে। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি-ই যদি নির্মুক্ত স্বাধিকারের ক্ষেত্রে 'স্বরাট' হয়, —তা হলে ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে অন্য ব্যক্তি-বিশেষের স্বাধিকার-সংঘাত অপরিহার্যভাবে বেজে উঠবে। সেই সংঘাত উত্তরণের অনিবার্য পথ হিসেবেই প্রত্যেক ব্যক্তি-বিশেষকে-'প্রত্যেকে মোরা পরের তরে'—ব্রত গ্রহণ করা-ই উচিত। সেই জন্যেই 'প্রত্যেক কে তার প্রাপ্যটুকু'—পুরিয়ে দেবার জন্যে ব্যক্তি মানুষের নির্মুক্ত স্বাধিকারের সীমা টেনে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মার্কসবাদী শ্রেণী সংঘর্ষের অনুমোদিত বিধি মেনে নেওয়া যায় না।

কিন্তু 'মানুষ অনিবার্যত-ই মুক্ত'—কাণ্টের এই স্বীকোরোক্তিকে যদি স্বীকার করতে হয় (অন্ততঃ কাণ্ট প্রত্যাহার করতে রাজি নন)—তাহলে স্বাধিকার সীমায়িতির কোন প্রশ্ন-ই আসে না। প্রশ্ন যে 'আসে না'—তার অন্যতম বলিষ্ঠ চেতনা—জ্যাপল-সার্ত্রে। কাণ্ট যদিও তার প্রথম বক্তব্য প্রত্যাহার না করেই ব্যক্তিক স্বাধিকারের 'প্রতিশ্রুতি' স্বীকার করেছেন,—কিন্তু সার্ত্রে কোন 'প্রতিশ্রুতি' বা 'সীমা' মেনে নিতে প্রস্তুত নন। সার্ত্রের স্বাধিকার-চেতনা সীমা ছেড়ে অসীমের পথে বাউল।

মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনা এবং ভালোবাসার উর্বর ভূমিতল হতেই সার্ত্রের দর্শনের সত্য সতেজ পল্লবিত হয়ে উঠেছে। তিনি মানুষের 'স্বাধিকার'-প্রসঙ্গে যে কোন সীমাবাদের যেমনি বিরোধিতা করেছেন, তেমনি 'বুদ্ধিবাদী'দের তির্যক ক্ষেত্র থেকেও মানুষকে ছিনিয়ে আনতে বদ্ধ পরিকর হয়েছেন। প্লেটোর যুগ থেকে বুদ্ধিবাদীদের দ্বারা শাসিত মানুষের কাছে সার্ত্রের মানবতাবাদ এবং স্বাধিকার চেতনা 'নন্দনের সংবাদ'-বহন করেই এনেছে। অনেক সমালোচকের দৃষ্টিতে যা—'নাটকীয়।' সার্ত্রের দর্শনে—মানুষ নির্জন-নিরানন্দ,—যা অনিবার্য উদ্বিগ্নতার শিহরণ-ই বহন করে আনে। এই নির্জন মানুষ-ই তার স্বাধিকারের 'যন্ত্রণা' থেকেই প্রশ্ন সচেতন এবং স্বাতন্ত্র্য তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। এ কথা খুবই যথার্থ যে, একজন মানুষ কখন-ই অন্য একজন মানুষের সত্তার প্রতিরূপ হতে পারে না। সার্ত্রে বলছেন,—'বাস্তবের নিষেধাজ্ঞায় মানুষ নিরবচ্ছিন্ন গতিতে অবিরাম তার ভবিষ্যতের প্রতিকূলে অবস্থান এবং অনির্দ্দেশ্য শূন্যতার মধ্যে আনুভূতিক পরিকল্পনাকেই অনুসরণ করছে।'

'স্বাধিকার'—একটি অপরিহার্য স্থিতধী-কল্পনা এবং পালনীয় ;—এই 'পালনীয়তা'র নির্মুক্তির জন্যেও স্থিতধী কর্ম-সাধনা প্রয়োজন ; এবং এই 'কর্ম-সাধনা' অপরিহার্য 'পালনীয়তা'র সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগের ভেতর দিয়েই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। জীবনের প্রেক্ষাভূমিতে মানুষ কখন একই চিহ্নিত সময়ে সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় সত্তার অবিচ্ছিন্ন প্রতিভূ হতে পারে না। কোন স্বচ্ছ যুক্তিতেই আরিষ্টটলের 'Law of Contradiction,' হেগেলীয় 'Law of Identity of Opposites. অথবা এঙ্গেলসের

'Anti Duchring'—ব্যাখ্যার অসম্ভব সম্ভাবনাকে মানতে পারছিনে বলেই এই প্রমূর্ত সত্যিকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। মানুষ প্রতিটি মুহূর্তেই নিজের রচয়িতা, এ ভিন্ন তার অন্য কোন পরিচিতি নেই এবং আর কিছু হতেও পারে না। মানুষ কখন-ই বিচ্ছিন্ন দর্শক নয়,—স্ব-চরিত্রের অবিচ্ছিন্ন অভিনেতা। সার্ত্রে বলছেন, কোন নিষ্ক্রিয় মানুষও 'তিনি এবং তার স্বাধিকারের'-মধ্যে তার 'স্বাধিকার'-কেই বেছে নেবেন। স্বাধিকার বা স্বাধীনতা নবীনতর পরিবর্তনের সূচনা করে। এই পরিবর্তন ব্যক্তির সীমা থেকে বিশ্বের অসীমে প্রসারিত।

সার্ত্রের প্রসঙ্গে সিমনের (Semone de Beauvoir) অধিকতর প্রসন্ন। তিনি বল্ছেন,—'মানুষ প্রতিভা মুক্ত ধরে নিয়েই তার স্বাধিকার বাস্তব ও সুরক্ষিত করে তুলতে তাকে প্রতিশ্রুত হ'তেই হ'বে।'—সার্ত্রে বল্ছেন,—'মানুষ অবশ্যই, নির্মুক্তি নির্বাচনে অ-বদ্ধ, নিজের 'হবার' জন্যেই যার স্বকীয় রচনার প্রয়াস, যে নিজেই 'স্ব-মান' (worthy), অনিঃশেষ নির্মুক্তিই তার ধ্রুপদী জীবন-ধারার ভিত্তি হ'বে।'—সার্ত্রের 'L,a,ge de raison', এ ডানিয়েল তাই 'নিজের ওপরেই বিশ্বাস রেখে'—আত্মবিশ্বস্ত , এবং 'Le Sang Des Autres'-এ ব্লোমার্ট আত্মসম্পূর্ণতার প্রবুদ্ধির জন্যেই বন্ধু বার্ট্রাণ্ড্-এর প্রশংসা কুড়িয়েছে।

বিশ্বের অলৌকিক রহস্যঘন শক্তির অনিবার্যতায় বিশ্বাসীরা একটি স্ব-নির্বাচিত নিরাপদ দূরত্ব থেকে মানব-স্বাধিকারের খরস্রোত ধারা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন। কাণ্ট যেমনি আগেই সার্ত্রেকে ছুঁয়েছেন, তেমনি এঁরাও 'নীতিবাদী'-র পরিচ্ছদে অজ্ঞেয়বাদীদের স্পর্শ করে গেছেন।—'নীতিবাদী'-রা এমন এক প্রাকৃত আদর্শ বা প্রমূল্যের কথা বল্ছেন,—'যা প্রদত্ত এবং অপরিবর্তনীয়',—এবং মানুষ তার সৃষ্টি বা পরিবর্তন কিছুই করতে পারে না। অস্তিবাদী সার্ত্রে এই—'প্রদত্ত এবং অপরিবর্তনীয়'—নীতিবন্ধের ভ্রূকুটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই কোটিতে সার্ত্রে হার্সাল্সের—'প্রপঞ্চবাদ'-কে (phenomenalism) শুধু অনুসরণ-ই করেন নি, তাঁর, 'Intentionality'-র বলিষ্ঠ প্রভাবকেও অস্বীকার করতে পারেন নি। হার্সাল্স্-ভাষ্যে, অভিজ্ঞতার অন্তর্নিহিত সত্যের নির্যাস-ই 'Intentionality'-র রচনা করে এবং অভিজ্ঞতা কিছু 'নির্বাচন' করে। প্রতিটি অভিজ্ঞতার ভেতরেই 'পূর্ব ও উত্তরায়ণ জ্ঞানলব্ধ চেতনা'—(Exfra Empirical and Trans-Empirical consciousness) নিহিত থাকে। এই প্রেক্ষিতে, প্রতিটি অভিজ্ঞতাই এক একটি উৎকর্ষ-প্রসঙ্গ নির্ভর। সার্ত্রের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে……'intention aims at 'not—yet', that which is not, not that which is latent, but that which is future'. সেই জন্যেই আত্ম সচেতন 'গরিয়সী চেতনা'-ই সংলব্ধ প্রমূল্যের ঘোষণা জানাতে পারে। 'নীতিবাদী'দের তীব্র আঘাত হেনে সার্ত্রে বলছেন যে, প্রমূল্য কখন-ও 'প্রদত্ত বা অপরিবর্তনীয়' নয় ;—'because values never is', মানুষ তা-ই, যেভাবে এবং যথার্থ রূপে সে নিজেকে রচনা করবে ;—মানুষ তাই কখন কখন প্রমূল্যের রচয়িতা এবং বাস্তবের রূপান্তর সাধক। মানুষের চেতনা, প্রয়োজন এবং প্রয়োজন-পূরনীয়ের দ্বারাই প্রমূল্য চিহ্নিত বা গঠিত।—সার্ত্রের স্বাধিকার চেতনার স্বরূপ-নির্নিতিতে অনুসৃত উক্তিগুলি অকৃত্রিম পাথেয় :

১. We have either behind us, nor before us, in a luminous realm of

values, any means of justification or excuse, we are left alone without excuse ;

২. Nothing can guarantee me against myself. Cut of from the world and of my essence by this, nothing that I am, I have to realise the meaning of the world of my essence. I decide it alone injustificable and without excuse ;

৩. All barries and railling collapse, annhiliated by the consciousness of my liberty.

সার্ত্রের এই অকৃপণ অভিভাষণে জগতের অপরিবর্তনীয় ধ্রুপদী নিয়ন্ত্রণে আস্থাভাজন রক্ষণশীলরা শিহরিত হ'য়ে উঠ্বেন। স্বাধিকারের এই স্বরূপকে তাঁরা মৃত্যু জাগর স্বাধীনতা (Dreadful liberty) বল্বেন। কিন্তু সার্ত্রে স্বাধিকার কল্পনায় মানুষকে কোন অবলুপ্তি-মুখীন ভীষণতা উপহার দিতে চান নি। মানুষের প্রতি তাঁর সুগভীর ভালোবাসার নিবিড়তার ভূমিতল থেকে যে স্বাধিকার চেতনা স্ফূর্ত হ'য়েছে,—তার যথার্থ অনুধাবন সহজ-গ্রাহ্য নয়। মানবিক স্বাধিকারের স্বীকৃতি-লিখনে কাণ্ট সার্ত্রের নৈকট্যে অবস্থান করেও ব্যক্তি স্বাধিকারের অক্ষুণ্ণার্থে বৃহত্তর প্রতিশ্রুতি বহনের কথা স্বীকার করে 'understanding maketh nature possible'-র কথা বলছেন। কাণ্ট মানুষ মুক্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব এবং অর্থ স্বীকার করেন না এবং তিনি মানুষকেই বিশ্বের রচয়িতা এবং মূল্যায়ক বলে মনে করেন। কাণ্টীয় ভাষ্যে,—মানুষ নীতিগত অর্থে মুক্ত এবং মানুষ স্ব-রচিত সব রকম অবস্থা-আশ্রয়ে, এবং সব রকম সম্ভাব্য-প্রেক্ষিতে আবেদন মূলক নিয়ম ও আদর্শের মেলবন্ধন রচনা করে কাজ করে যায়। সুতরাং মানুষ তার স্বাধিকারে—'স্বরাট'। কাণ্ট 'স্ব' (self)-এর নিমিত্ত 'স্ব'-(self) নিরূপিত স্বকীয় সীমানাকেই (intrinsic determination) 'স্বাধীনতা' আখ্যা দিয়েছেন। এই সংজ্ঞার্থকে স্বীকার করলে এ সত্য মানতেই হয় যে, কোন 'স্ব'-(self)-এর নিয়ন্ত্রণে যে কোন শক্তি বা নিয়মের নিয়োজন-ই অনুচিত। এখানেই কাণ্ট এবং সার্ত্রের স্বাধিকার বোধ আত্মীয় হ'য়ে ওঠে এবং উভয়ের বিভাজন সুকঠিন হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এই দুই ব্যক্তিত্বের চিহ্নিত সরণি বেয়ে একটু গভীরে প্রবেশ করলে 'উভয়ের বিভাজন কঠিন'-ধারণা যে বিশ্লেষকের ভ্রান্তিজাত সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। এই দু'টি ধারণার চিহ্নিত পার্থক্যের 'আদি সূত্রের' অস্তিত্বকে ভুলে গেলেই এই ভ্রান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি সচেতন ভাবে কাণ্টের স্বাধিকার চেতনা নিরীক্ষণ করি তা' হ'লে সাম্প্রতিক দর্শন জগতের অপরিহার্য একটি মৌলিক সত্যের দেখা-ই মাত্র পাব না,—সেই প্রস্তরিত পথ বেয়েই আমরা কাণ্ট সম্পর্কে সার্ত্রের স্বাধিকার চেতনার নির্মুক্ত এবং ভয়ঙ্কর বোধ বিক্ষেপন থেকে সরে আসব। মানুষ চেতনা উপলব্ধিতে নির্বিরোধ, কিন্তু সেই চেতনার অযৌক্তিক ভিত্তিস্থিতি কাণ্টীয় দর্শনে বর্জিত। 'মুক্ত-ইচ্ছা' কারণ নির্ভর ; এবং যৌক্তিকতা ও স্বাধিকার আত্মলীন। কাণ্টীয় দর্শনে অযৌক্তিক স্বাধিকার মূল্যহীন। সুতরাং, 'মানুষ অনিবার্যত মুক্ত'—এই অভিজ্ঞতা 'মানুষ অনিবার্যত সামাজিক'—এই প্রতিষ্ঠিত চেতনায় লীন হ'য়ে গেছে। এখানেই কাণ্ট স্বকীয় গতিতে সার্ত্রে থেকে সরে আসছেন।

কিন্তু অস্তিবাদীরা যৌক্তিকতাকে জীবনের একটি দিক হিসেবে আপাত মেনে নিয়েও সত্যের সন্ধানে তা' অতিক্রম করে যান। তাঁরা জানেন যে, যৌক্তিকতা শুধু বাস্তবকে বিকৃত-ই করে না,—যৌক্তিকতা '…Untrust worthy path to understanding' পিশাক্যল রূপকাঙ্গে (Alligori-cally) বল্ছেন যে, সব কিছুর কারণের মত 'অস্তরেরও কারণ আছে এবং যা' চিরন্তন অজ্ঞাত।' —সার্ত্রে কেন্দ্রভূমি অধিকৃতিতে সেই মানুষকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন, যে মানুষ অনুভূতি, আবেগ, অপরাধিত্ব এবং নৈতিকতাবোধে গতিশীল এবং সজীব। কাণ্টের বিপরীতার্থ সংজ্ঞায়িত এই মানুষ অবিচ্ছিন্ন 'সামাজিক' নয়। 'মানুষ অনিবার্যত সামাজিক'—কাণ্টের এই ধারণাকে অস্বীকার করে সার্ত্রে অকপট স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, মানুষ কথন কথন 'অনিবার্যত অসামাজিক।'

অপলাপ বা উন্নীতির প্রেক্ষিতে যদি কথন-ও মানুষের জীবনে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়—তবে তা' নিশ্চয়-ই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হ'বে ; এমন কি তার সীমা এবং প্রমূল্যও—যা' তা'র সার্থকতা এবং অসার্থকতা প্রসঙ্গে স্থিরিকৃত হ'বে। এই ধারণায় ঝুঁকি এবং হতাশা অনিবার্য ; কিন্তু ঝুঁকি আর হতাশার প্রতিকূলে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ভেতর দিয়েই জীবনের সত্য স্বাক্ষর সূচিত হয়। 'মানুষ একটি অপ্রয়োজনীয় আবেগ'—বলে সার্ত্রে আকস্মিক নাটকীয় ভঙ্গীতে ছেদ টান্ছেন।

মানুষের স্বাধিকার চেতনায় সার্ত্রের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠ হলেও--নাট্য রস সিক্তি। সার্ত্রের নাটকের পাঠক বা দর্শক হিসেবে আমরা যথন দেখি যে তাঁর নায়ক অ-বদ্ধ স্বাধিকার প্রমত্ততায় বলছে : (১) সমস্ত বাঁধন এবং অন্ধ-সীমানা আমার স্বাধিকার চেতনায় বিলুপ্ত হয়েছে ; এবং (২) আমার সম্পর্কে, কিছুই প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না…শুধু আমি-ই, বিচার এবং কৈফিয়ৎহীন ভাবে নির্ধারণ করব'—তথন আমাদের গহন থেকে এক শীতল প্রীতিধারা উৎসারিত হলেও তীক্ষ্ণধার বাস্তবের আঘাতে এই প্রজ্ঞান কেঁপে ওঠে। এই প্রজ্ঞান আমদের গতদৈনিকের প্রবহ জীবনের কাছে অনাত্মীয় ;—বলা যেতে পারে 'অসামাজিক' এবং যা 'অসামাজিক মানুষের' ক্ষেত্রেই সত্যি।

নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ

গোরাচাঁদ মিত্র

ব্যবহারজীবী চিত্তরঞ্জন, রাজনীতিক চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে কবি চিত্তরঞ্জনও ছিলেন সে বিষয়ে আমাদের জানার পরিধি সীমিত। এই সীমিত জানার কারণ তাঁর রাজনৈতিক জীবন অনেকথানি আড়াল করে রেখেছে তাঁর কবিসত্বার পরিচিতি। কবি হিসেবে তাঁর জীবনে প্রতিষ্ঠা এসেছিল। মালঞ্চ, মালা, সাগরসঙ্গীত, অন্তর্যামী ও কিশোর-কিশোরী নামে তিনি পাঁচটি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। অবশ্য কালের বিচারে সেগুলি কতথানি রসোত্তীর্ণ সে প্রশ্ন ভিন্ন। কিন্তু তিনি যে কাব্য ও সাহিত্য পিপাসু মনের অধিকারী ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এবং সেই আন্তরিক তাগিদেই তিনি একটি বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল বাঙলা ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে—ইংরেজী ১৯১৪ সালের শেষাশেষি। পত্রিকার নাম ছিল নারায়ণ, আয়ুষ্কাল চার বছর। চিত্তরঞ্জনের কাব্যিক মানসের মূল্যায়নে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি আলোচনা প্রকাশিত হলেও, নারায়ণ পত্রিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আজও হয়নি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নারায়ণ পত্রিকার দান কতটুকু এবং নারায়ণের কষ্টিপাথরে সাধারণে অল্পপরিজ্ঞাত, চিত্তরঞ্জনের সম্পাদকীয় ভূমিকার মূল্যায়ণ-এ প্রবন্ধের বিচার্য।

নারায়ণ পত্রিকার কার্যালয় ছিল ২০৮/২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে। ২০নং পটুয়াটোলা লেনের বিজয়া প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হত। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন রমেশচন্দ্র চৌধুরী। প্রত্যেক সংখ্যার দাম ছিল পাঁচ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। ডাকমাশুল সহ বার্ষিক মূল্য ছিল সাড়ে তিনটাকা। নারায়ণ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিষয়সূচী ও লেথকগণ হলেন—(১) স্তব সম্পাদক, (২) অন্তর্যামী (কবিতা)—সম্পাদক, (৩) নূতনে পুরাতনে (প্রবন্ধ)—বিপিনচন্দ্র পাল, (৪) মৃণালের কথা (গল্প)—বিপিনচন্দ্র পাল, (৫) বৌদ্ধধর্ম (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, (৬) হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব (প্রবন্ধ)—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, (৭) পৌরাণিকী কথা (প্রবন্ধ)—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, (৮) বৃন্দাবন (ভ্রমণ কাহিনী)—জলধর সেন, (৯) আমার শিল্প (প্রবন্ধ)—সরযূবালা দাশগুপ্তা। প্রথম সংখ্যায় কোন সম্পাদকীয় রচনা ছিল না। সাধারণতঃ নতুন কোন পত্রিকা প্রকাশিত হলে পত্রিকা সম্পাদক প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন—কেউ কুণ্ঠিতভাবে, কেউবা সগর্বে। 'নারায়ণ' এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। অবশ্য 'নারায়ণের' কোন সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় পাতার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটে না। তাই চিত্তরঞ্জনের ভাষায় 'নারায়ণ' প্রকাশের উদ্দেশ্য আমাদের অজ্ঞাত থেকে যায়। দেশবন্ধু দুহিতা অপর্ণাদেবী তাঁর 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' স্মৃতিকথামূলক রচনায় অবশ্য পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিথছেন—'বাংলার প্রাণধারার সন্ধান নেবার এবং দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আমাদের তথাকথিত ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে তথন বাংলা সংস্কৃতির আদর ছিল না ; বিশেষ করে দেশের সংস্কৃতির দিকে এ সমাজের তেমন দৃষ্টি ছিল না বললেও চলে।

তাই বাবা নারায়ণ পত্রিকা বার করে সমাজের এ অংশটিকে সচেতন করার এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে একটা নতুন রূপ দিয়ে তার স্বতমান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। এই পত্রিকার মাধ্যমেই আমাদের দেশের নাটক, কাব্য, ধর্ম, সঙ্গীত, চারুকলা, সংস্কৃতি, অনুবাদ সাহিত্য ও সমালোচনা সাহিত্য জাতির সামনে এক নতুন দৃষ্টিতে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্যরূপকে আবেগহীন অথচ দৃঢ়ভাষায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে'। বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে অপর্ণা দেবীর বক্তব্য কিছুটা অতিশয়োক্তি মনে হওয়া স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যের সাময়িক পত্রের জগতে তখন ভারতী সবুজপত্র—প্রবাসীর কাল। সাহিত্যকালের মধ্যগগনে রবীন্দ্রনাথ। তথাপি নারায়ণ পত্রিকা যে বাংলা সাহিত্য জগতে বিশেষ করে প্রবন্ধ সাহিত্যে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছে, তা অবশ্যই স্বীকার্য। নারায়ণ প্রকাশকালে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের প্রত্যহিক দিনগুলি ছিল কর্মমুখর। ব্যবহারজীবী মহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা তখন সর্বোচ্চ শিখরে। আমার অনুমান—ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের সমগ্র দিনে সাহিত্য চর্চার জন্য অবসর মিলতো খুব সামান্যই। কিন্তু তিনি ছিলেন যথার্থ সাহিত্য প্রেমী এবং সেই কারণেই প্রকাশ করেছিলেন নারায়ণ পত্রিকা। তাঁর মনে হয়তো এ আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল কর্মব্যস্ত জীবন থেকে সাহিত্যচর্চার অবসর খুঁজে নিয়ে কতদিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে তিনি নারায়ণের মাধ্যমে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করে যাবেন। তাই বোধহয় স্বভাব বিনয়ী চিত্তরঞ্জন 'বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিব, উন্নতি করিব' ইত্যাদি (তাঁর কাছে অহংকারসুলভ) সম্পাদকীয় সযত্নে পরিহার করেছেন। পরিবর্তে নরনারায়ণের পাদপদ্মে প্রণামাঞ্জলি নিবেদন করে শুরু করেছেন নারায়ণ পত্রিকা। আত্মোৎসর্গ করেছেন সেই অসীম পুরুষের কাছে, প্রথম রচনা স্তব—এর মাধ্যমে। তাঁর দৃষ্টিতে নারায়ণ হলেন—'তুমিই জীবের জীবনভূমি। সকল জীবের তুমি একমাত্র উপায়, একমাত্র অবলম্বন।...তুমি ভিন্ন সকল সৃষ্টি মিথ্যা, সকল জীব মায়া পুত্তলিকা।...তুমি দেহ, তুমিই আত্মা; তুমি সাধনা, তুমিই সিদ্ধি; আদি তুমি, অনাদি তুমি; অন্ত তুমি, সান্ত তুমি।' নারায়ণ পত্রিকাকেও বোধহয় তিনি স্তব এর মাধ্যমে 'সীমার-মাঝে-অসীম-তুমির' পায়ে উৎসর্গ করেছিলেন।

সাহিত্য পত্রিকার নাম নারায়ণ—হয়ত আমাদের কানে অভ্যস্ত নয়। এক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিমানস। পরবর্তী রচনা 'অন্তর্যামী' কবিতাতেও আমরা তাঁর ঈশ্বর সন্ধানী মনের গভীর আকুতির পরিচয় পাই। বৈষ্ণবীয় রীতিতে তিনি মিলিত হতে চেয়েছেন পরমাত্মার সঙ্গে।

...প্রমোদের দীপ জ্বালি খুঁজেছি তোমারে
যৌবনে সকল মনে আপনা বিকাই,
পুষ্পিত, ঝঙ্কৃত সেই আলোক আগারে
আমার সুখের মাঝে সুখ খুঁজি নাই,
তুমি জান দুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান
তোমারে, তোমারে শুধু! পাই বা না পাই,—
বঁধু হে, বঁধু হে! আমি তোমারেই চাই
যে পথেই লয়ে যাও! সে পথেই যাই।

'নারায়ণে'র আরও কয়েকটি সংখ্যায় চিত্তরঞ্জন একই শিরোনামে আরও কয়েকটি কবিতা লেখেন এবং প্রত্যেকটিই ১৯১৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'অন্তর্যামী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৩-১৪ সালে মাত্র একবছরের মধ্যে চিত্তরঞ্জনের মা ও বাবা উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করেন। এঘটনা তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কবিমন উভয়কেই গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ 'অন্তর্যামী' শীর্ষক কবিতাগুলি। নারায়ণের প্রথম সংখ্যা থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত 'বৌদ্ধধর্ম' ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পৌরাণিকী কথা' প্রবন্ধ দু'টি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রবন্ধ-শিরোনামেই প্রবন্ধকারগণের বক্তব্যের বিষয়বস্তু পরিস্ফুট। 'হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব' প্রবন্ধে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সুচারু বিশ্লেষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—"ইংরাজীতে এক কথায় হিন্দুর বিশেষত্বের বা হিন্দুত্বের মূলসূত্রটি ব্যক্ত করিতে হইলে বলিতে হয় যে—দি হিন্দু নট্ ওন্‌লি স্টারট্‌স্ ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স' অ্যাজ এ হমোজীনিঅ্যাস্ হোল্, বাট্ অলওয়েজ্ ইন্ ইন্‌ভেসটিগেটিং দি ম্যানিফোলড্ ইন্ দি রিয়েল্ ওয়ার্ল্ড, রিটার্ণস্ টু দি অ্যাক্‌চিউঅ্যাল্ সিন্থেটিক্ ইউনিটি ইন্ দি 'আত্মা'.. "। 'নূতনে-পুরাতনে' প্রবন্ধে মনস্বী বিপিনচন্দ্র পালের বিচার্য নতুন-পুরাতনের সমন্বয় আমাদের সমাজে কী ছাপ রেখে গেছে বা যাচ্ছে। নিজের সংস্কৃতিকে অবহেলা করে একদিন পাশ্চাত্যসভ্যতার দিকে আমরা ছুটেছিলাম। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাদের জিজ্ঞাসু করেছে। সেই সভ্যতার রীতিনীতিগুলো নেড়ে চেড়ে বিচার করে দেখেছি। খুঁজে পাইনি মুক্তির পথ! তাই আবার ফিরে এসেছি নিজের ঘরেই। কিন্তু এই নতুনের স্পর্শে আমদের মধ্যে জন্মেছে সংস্কার বর্জনের ক্ষমতা। লাভ করেছি বিচারের অধিকার এবং এই বিচারের মাপ কাঠিতে আজ নিজেদের সনাতন সভ্যতার ভালমন্দ নির্ণয় করে সত্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে সমন্বয় ঘটাচ্ছি সার্বভৌমিক বিশ্বসমস্যার।

'নারায়ণে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের মৃণালের কথা গল্পটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। 'মৃণালের কথা' রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত স্ত্রীর পত্রকে ব্যঙ্গ করে লেখা। স্ত্রীর পত্রের নারীপ্রগতি চেতনাকে নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করেছিলেন গল্পকার। এই গল্প প্রকাশের মাধ্যমে প্রথম সংখ্যা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নারায়ণের রবীন্দ্র-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী। প্রথম চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। বিপিনচন্দ্রের মৃণালের কথা প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ মাসে। স্ত্রীর পত্রের ঘটনা যেখানে শেষ, মৃণালের কথা সেখান থেকে শুরু। 'মৃণালের কথা' আজ পর্যন্ত অনালোচিত, তাই এ বিষয়ে কিছু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। মৃণাল আর কোনদিন ২৭নং মাখন বড়ালের গলিতে ফিরে আসবে না—এ সংবাদ পেয়ে মৃণালের ননদ তার ঠাকুরপো নরেনকে পাঠালো পুরীতে মৃণালের কার্যকলাপ সম্বন্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে এবং দাদাকে (অর্থাৎ মৃণালের স্বামীকে) সান্ত্বনা দিল মৃণাল অবশ্যই ফিরে আসতে বাধ্য হবে। ঘটনাচক্রে নরেন পুরীতে মৃণালের বাসাতেই বসবাস শুরু করে, আত্মপরিচয় গোপন রেখে। নরেন ও মৃণালের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে স্নেহের 'দিদি—ভাই' সম্পর্ক। মৃণালের কবি-কবি ভাব নরেনের মনে বিরূপতা সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে মৃণালের ভাই শরতের মারফৎ গল্পে উপস্থিত বিলেত ফেরতা এক নব্য কবি। তাঁকে পেয়ে মৃণালের কাব্যচর্চা বা 'কবিতার পাগলামি' যেমন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল, তেমনি নব্যকবি

পরকীয়া প্রেমে মেতে উঠলেন। নরেনের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে নব্যকবি একদিন মৃণালকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলেন। ডিটেকটিভ নরেনও পিছু নিল। নরেন বৌদিকে চিঠিতে লিখছে—'হঠাৎ যেন একটা অস্ফুট চীৎকার কাণে গেল। সেই শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে গিয়ে দেখি, ঐ লোকটা তোমার মেজবউকে অপমান করার চেষ্টা করছে'। নরেনের হাতে জুতো পেটা খেয়ে নব্যকবি পালালেন। বাড়ী ফিরে মৃণাল অসুস্থ হয়ে পড়ল। নরেনের পরিচয় ইতিমধ্যে প্রকাশ পেল। বাড়ী ফিরে যাবার জন্য নরেনের পীড়াপীড়ি মৃণালকে টলাতে পারল না। যে বিন্দুর আত্মহত্যার খবর পেয়ে মৃণাল পুরী চলে এসেছিল, কলকাতা থেকে খবর এল বিন্দুর মৃত্যুসংবাদ ভুল। বিন্দু চিঠিও লিখল মৃণালকে সে এখন স্বামী-সোহাগিনী এবং মৃণালকে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে অনুরোধ করল। মৃণালের মন পরিবর্তন হয়েছে। স্বামী আসছেন তাকে নিয়ে যাবার জন্য। নিজের দোষ স্বীকার করে স্বামীকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখল মৃণাল। 'মৃণালের কথা' এখানেই শেষ। মৃণালের কথা পড়ে আমরা দুঃখিত হই তিনটি কারণে। প্রথমতঃ এটি বিপিনচন্দ্রের মত একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় মনস্বীর লেখা বলে। দ্বিতীয়তঃ যে চিত্তরঞ্জন তাঁর কন্যা অপর্ণাদেবীর অসবর্ণ বিয়ে দিয়ে সমাজে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাতেই এই নারীপ্রগতি বিরোধী ব্যঙ্গগল্প প্রকাশিত হতে দেখে। তৃতীয় কারণ, মৃণালের কথা পড়ে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে স্বরঞ্চরে সহজ সাবলীল ভাষায় সুন্দর গল্প লেখার ক্ষমতা বিপিনচন্দ্রের করায়ত্ত ছিল, কিন্তু তিনি কয়েকটি রবীন্দ্রগল্প বিরোধী 'ব্যঙ্গগল্প' রচনা করা ছাড়া আর কোন গল্প লেখেননি। বিপিনচন্দ্র তাঁর মৃণালের কথায় প্রথম থেকেই এই প্রমাণে ব্যস্ত, যে নিজের সংসার সম্বন্ধে যে ধারণা মৃণালের হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভুল। মৃণালকে দিয়ে তা' গল্পের শেষাংশে স্বীকার ও করিয়েছেন।

নারায়ণ পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রবন্ধের তালিকায় যুক্ত হয় যথাক্রমে বিপিনচন্দ্রের 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ব' ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতির স্মৃতিকথা 'সেকালের স্মৃতি—বঙ্কিমচন্দ্র'। দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাঙ্গলা নাট্য সাহিত্যের পূর্বকথা' প্রবন্ধের দ্বারা প্রবন্ধকার শরচ্চন্দ্র ঘোষাল প্রথম বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস অন্বেষণে সচেষ্ট হন। নাটক বিষয়ে তাঁর আরও দুটি প্রবন্ধ 'প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক' ও 'বাঙ্গালার আদি নাটক' নারায়ণের তৃতীয় ও পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবি চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় 'ভালিম' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। দুশ্চরিত্র বড়লোক নায়ক ও এক বারবিলাসিনীর প্রেমকথা এ কাহিনীর উপজীব্য গল্পটি বিয়োগান্তক। চিত্তরঞ্জনের বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থে 'ভালিমের' আলোচনা থাকায়, এ বিষয়ে নতুন করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। নারায়ণের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত অপর দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ—বিপিনচন্দ্রের 'ভাষার কথা' ও তরুণ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'শক ও শকাব্দ'। সাধুভাষা ও চলিত ভাষার—কোনটি বাঙ্গলা সাহিত্যে ব্যবহৃত হবে, এ প্রশ্নে সে যুগে প্রবল বিতর্ক চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধটি রচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য মৃণালের কথায় বিপিনচন্দ্র চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। বিপিনচন্দ্রের মতে যুগ বিবর্তনের সঙ্গে ভাষাও পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন স্তব্ধ হয়ে গেলে বুঝতে হবে হয় সংশ্লিষ্ট জাতি বা সমাজের সাহিত্যসৃষ্টি ও জ্ঞানার্জনের শক্তি লোপ পেয়েছে নতুবা প্রাত্যহিক জীবনের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার দুস্তর

ব্যবধান। আমাদের নিজের ভাষাতেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের 'এবারৎ' বা ষ্টাইল, এবং 'তারপরে রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালা গদ্য এবারতের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ সকলের মধ্যে কত প্রভেদ'। বিপিনচন্দ্র কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির উচ্চপ্রশংসা লক্ষণীয়। ব্যাকরণের কাঁটা কম্পাস দিয়ে লিখলে রচনা বিশুদ্ধ হলেও, তা সরস ও জীবন্ত হতে পারে না। তাই ভাষার পরিবর্তনে ভয়ের কিছু নেই। এ কথার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন নয়। প্রত্যেক ভাষার যে নিজস্বতা আছে তা' অপরিবর্তনীয়। এবং এই স্বকীয়তা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধযোগ্য। নারায়ণের তৃতীয় সংখ্যায় একই শিরোনামে আর একটি রচনায় মন্মথনাথ বসুর মত 'ভাষাতে লোকে প্রাণ খোঁজে, পোষাক নহে'। কাজেই লেখক যে রকম ভাষাতেই লিখুন না কেন, সৃষ্টি মহত্তর হলে তা সর্বজনগ্রাহ্য। 'শক ও শকাব্দ' প্রবন্ধে শকজাতির আদি বাসস্থান কোথায় ছিল, কবে তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করল ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে ব্রতী সেদিনের তরুণ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। প্রবন্ধ শেষে পাদটীকায় তিনি স্পষ্ট লিখেছিলেন তাঁর অভিমত তিনি পাঠকদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চান না—প্রবন্ধটি তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের দর্পণ। লেখক তালিকায় রমেশচন্দ্রের নাম দেখে বোঝা যায়, পত্রিকা সম্পাদক তরুণ লেখকদের প্রতি সহৃদয় ছিলেন।

'নারায়ণে'র চতুর্থ সংখ্যায় অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে তিনটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—হরিপদ কাব্য-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ মহাশয়ের 'চার্বাক দর্শন', বিপিনচন্দ্রের 'বর্তমান হিন্দুধর্মের দেববাদ ও 'দেবোপাসনা' এবং সম্পাদক চিত্তরঞ্জনের 'কবিতার কথা'। সাহিত্যক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন মূলতঃ কবি। তাই কবির ভাষ্যে কবিতার কথা শোনার আগ্রহ উপেক্ষণীয় নয়। তদুপরি, সমকালীন কবিদের কবিতা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত সাধারণ অভিমত ও কবিতার কথায় ধরা পড়েছে। এ প্রবন্ধে চিত্তরঞ্জনের আক্ষেপ আধুনিক কবিতায় আর প্রাণের 'পরশ' মেলে না। কারণ জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে আধুনিক কবিদের সংযোগ নেই। 'জীবন লইয়াই কবিতা। যে শুধু ছোবড়া খায়, সে কখনও ফলের স্বাদ পায় নাই। যে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান না পায় সে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আর যে ছোবরা না ছাড়াইয়া ফল খাইতে চায়, সেও ফলের স্বাদ পায় না। সে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির একটা মনগড়া কল্পিত লোক সৃজন করে মাত্র। শূন্য আকাশে যেমন গৃহনির্মাণ করা যায় না, সেইরূপ এই কল্পিতলোকে কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না'। আধুনিক কবিদের ত্রুটী এখানেই। চিত্তরঞ্জন বলছেন—চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস থেকে কৃষ্ণকমল গোস্বামী, নিধুবাবু পর্যন্ত কবিতায় মহাজীবনের ইঙ্গিত মিলত, আজ তা কোথায় হারিয়ে গেল। কবি বা কবিতার আদর্শ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের অভিমতের বিরুদ্ধমত প্রকাশ সম্ভব নয়. তথাপি চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের সঙ্গে একই আসনে বসার অধিকারী কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও নিধুবাবু নন নিশ্চয়। চিত্তরঞ্জন স্ব-আদর্শ অনুযায়ী কবি বা কবিতার বিভাগীয় বিভাজনে নিজেই অক্ষম। চণ্ডীদাসের 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম···' এই বহুশ্রুত পদটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ না করে তাঁর 'ভালবেসে সখি! নিভৃত যতনে/আমার নামটি লিখিয়ো তোমার/মনের মন্দিরে।/আমার পরাণে যে গান বাজিছে/তাহারি তালটি শিখিয়ো তোমার/চরণ-মঞ্জীরে' কবিতার তুলনা করে চিত্তরঞ্জন এই

সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন শেষোক্ত কবিতায় প্রাণের স্পন্দন নেই, আকুলতা নেই, জীবন বা মহামিলন মন্দির থেকে তা' দূরে বহুদূরে। চিত্তরঞ্জন যখন রবীন্দ্রনাথের লেখা উপরিউক্ত পঙক্তিগুলোয় প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পান না, তখন আমাদের দুঃখিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কবি ও কবিতা সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের সঠিক ধারণা থাকলেও, তাঁর ব্যক্তিগত ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা সেই ধারণা বা সংজ্ঞা নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেনি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ স্বনামধন্য পুরুষদের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্পাদক চিত্তরঞ্জন 'নারায়ণ' পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যা অর্থাৎ ১৩২২সালের বৈশাখ সংখ্যা বিশেষ বঙ্কিম-স্মৃতি সংখ্যারূপে প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাছে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন না, ছিলেন একটি যুগ (অপর্ণাদেবী : মানুষ চিত্তরঞ্জন)। বঙ্কিমের সাহিত্যকীর্তি ও হিন্দুজাতীয়ত্ববোধ চিত্তরঞ্জনকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। বঙ্কিমস্মৃতি সংখ্যায় অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদক চিত্তরঞ্জন বিদগ্ধ মননশীল লেখকদের দ্বারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ও ব্যক্তিমানস বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন। অদ্যাবধি বাঙলা সাময়িক পত্রের জগতে যে ক'টি বঙ্কিমস্মৃতি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে নারায়ণের আলোচ্য সংখ্যাটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। আমার বক্তব্যের সমর্থনে বঙ্কিম স্মৃতি সংখ্যার বিষয়সূচী ও লেখকগণের নাম উদ্ধৃত করলাম। (১) বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, (২) বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত—ঐ, (৩) অর্জুনা পুষ্করিণী—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই), (৪) বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা—ঐ, (৫) বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, (৬) সেকালের স্মৃতি : বঙ্কিমচন্দ্র—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, (৭) ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, (৮) রজনী (সমালোচনা)—জ্ঞানাঞ্জন পাল, (৯) বঙ্কিমবাবু—ললিতচন্দ্র মিত্র (দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র), (১০) বঙ্কিমমণ্ডল বা বঙ্গদর্শন (কবিতা)—বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, (১১) বঙ্কিমপ্রসঙ্গ ও গীতার কথা—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, (১২) বঙ্কিমস্মৃতি—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৩) বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার দ্বারবান পাঠক—জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (১৪) ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৫) চরিত চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র—বিপিনচন্দ্র পাল, (১৬) স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ। পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছিল ছ'পৃষ্ঠা ব্যাপী বঙ্কিমের হস্তলিপি। এ সংখ্যায় ১৩টি মূল্যবান আর্ট প্লেটও ছিল। প্রত্যেকটি রচনাই স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হলেও, বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ-গীতার কথা' প্রবন্ধ থেকে একটি তথ্য এখানে উদ্ধৃত করলাম, সাধারণে অল্পজ্ঞাত বলে। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে বঙ্কিমবাবু গীতার বিশেষ আলোচনা করিতেছিলেন। কেবল ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র নহে তিনি বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজের জন্য গীতার এক অভিনব ভাষ্যও রচনা করিতেছিলেন। এবং ইহার কিয়দংশ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিতও হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে তাঁহার ধারণা এই যে গীতার শেষ ছয় অধ্যায় পরবর্তীকালের যোজনা। উহারা মৌলিক গীতার অন্তর্গত নহে।... ঐদিন বঙ্কিমবাবুর সহিত গীতার প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন যে, তদানীন্তন ভারতীয় সুধীসমাজে কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ নামে যে সাধন প্রণালী প্রচলিত ছিল, গীতাকার

অদ্ভুত প্রতিভাবলে তাহার অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর মুখে এই প্রথম গীতার সমন্বয়বাদের সন্ধান পাইলাম'। আমাদের দুর্ভাগ্য, গীতা ভাষ্য রচনা করার প্রয়োজনীয় সময় বঙ্কিমচন্দ্র পাননি। 'নারায়ণে'র প্রথম বর্ষের প্রথম খণ্ডের অর্থাৎ প্রথম ছয়টি সংখ্যার আলোচনা এখানেই শেষ।

নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ সাল) প্রকাশিত তিনটি মূল্যবান রচনা হল—ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ভাষার কথা—প্রফুল্লকুমার সরকার, শঙ্করাচার্য কর্তৃক জৈনমত খণ্ডন—শ্রীদ্বিজদাস দত্ত। ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রবন্ধটি ১৩২২ সালের ১লা বৈশাখ ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে খগেন্দ্রনাথ মিত্র পাঠ করেন। তাঁর ভ্রমণের দূরত্ব মাত্র বর্ধমান পর্যন্ত, 'লোটা কম্বল লইয়া জলধরদাদার (সেন) মত গঙ্গোত্রীর পথে' তাঁর যাত্রা সম্ভব হয়নি। তথাপি এই ক্ষুদ্র ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়েই একটি সুন্দর রম্যরচনা উপস্থাপিত করেছেন খগেন্দ্রনাথ। 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে প্রফুল্লকুমার লিখেছেন—বাঙ্গালা সাহিত্যকে বাঙ্গালীর সাহিত্য করিতে হইলে তাহাকে কলিকাতার বা ঢাকার আটপৌরে ভাষায় রচনা করিলে চলিবে না। তাহাকে সমগ্র বাঙ্গালীর সেব্য ও উপভোগ্য সার্বজনীন বাঙ্গালা ভাষাতেই আকার দিতে হইবে। এখনকার লিখিত ভাষাই সেই সার্বজনীন ভাষা'। 'ভাষার কথা' শিরোনামে যতীন্দ্রমোহন সিংহ তৃতীয় সংখ্যায় আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। এটি ছিল উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি প্রমথ চৌধুরীর অভিভাষণের সমালোচনা। প্রমথ চৌধুরীর ভাষণটি সবুজপত্রে ১৩২১ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচনাটি দীর্ঘ হলেও যতীন্দ্রমোহন স্পষ্টভাষায় একবারও তাঁর নিজের মত প্রকাশ করেন নি। সমালোচনাটি ছিল অনেকটা 'ধরিমাছ না ছুঁই পানি' গোছের। যদিও বুঝে নিতে কষ্ট হয় না তিনি সাধুভাষার সমর্থক। ভাষার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন অহেতুক রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর অভিযোগ 'রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে চিন্তা করেন, বাংলায় কবিতা রচনা করেন'। (অন্ধ বিরোধিতার বোধহয় এটিই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।) রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবোধ্য। তিনি লিখছেন—'রবীন্দ্রনাথের পুলক যদি গাছে গাছে না নাচিয়া নরনারীর গাত্রে কদম্ব কুসুমের ন্যায় বিকশিত হইত, তাঁহার সঙ্গীত যদি আকাশে না ঘুমাইয়া নরনারীর কণ্ঠে সুরতান লয় যোগে মুখরিত হইত, তাঁহার ক্রন্দন যদি কাহারও পিছে পিছে না ধাইয়া নরনারীর বুকের মধ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়া অশ্রুধারারূপে বিগলিত হইত, তবে দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত পণ্ডিতমূর্খ সকলেই তাঁহার কথা বুঝিতে পারিত'। প্রমথ চৌধুরী আষাঢ় সংখ্যার সবুজ পত্রেই যতীন্দ্রমোহনের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করেছেন, পরিশেষে রবীন্দ্রকাব্য প্রসঙ্গে লিখেছেন—'তাঁর প্রবন্ধ পড়ে আমার শুধু এই মনে হয় যে, মানুষের বোঝবার ক্ষমতার সীমা আছে. কিন্তু তাঁর না বোঝবার ক্ষমতা অসীম'।

'নারায়ণ' পত্রিকার প্রথম বর্ষের অবশিষ্ট সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল-কথা সাহিত্য—সুখরঞ্জন রায় (২য় সংখ্যা), মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা ও সরমা—দীননাথ সান্যাল, গতি ও স্থিতি—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (৩য় সংখ্যা), কবিতার কষ্টিপাথর—বিপিনচন্দ্র পাল, কালিদাসের মেয়ে দেখান—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (৪র্থ সংখ্যা), নাটুকে রামনারায়ণ—নলিনীকান্ত ভট্টশালী (৫ম সংখ্যা), বাঙ্গালীর প্রতিমা পূজা ও দুর্গোৎসব—বিপিনচন্দ্র পাল; সঙ্গীতে বিজ্ঞান—

শিশিরকুমার মিত্র ও দুর্গোৎসবে নব পত্রিকা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (৬ষ্ঠ সংখ্যা)। নারায়ণের ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যায় প্রথম 'জীবনে পণে' শীর্ষক একটি নাটক প্রকাশিত হয়। মঞ্চোপযোগী নাটক নয়, পরিবর্তে নাট্যকার সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের ভাষায় 'কথানাট্য'। 'মরণে জয়', 'আঁধার ঘরে', 'হাসির দাম' নামে আরও তিনটি সত্যেন্দ্রকৃষ্ণের কথানাট্য নারায়ণের ২য় খণ্ডের ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'কবিতার কষ্টিপাথর' প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র মাইকেল মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাগীতির 'নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে! /রাধিকারমণ/চল সখি ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের ছবি/ব্রজের রতন'—এই লাইনগুলির সঙ্গে গিরিশ ঘোষের 'যাই গো, ওই বাজায় বাঁশী/প্রাণ কেমন করে। /না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে/মান ভরে'—এই কবিতা-পঙক্তির তুলনা করে বলছেন—'মধুসূদনের পঙক্তিতে বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। তিনি বই পড়ে এই রচনা সৃষ্টি করেছেন। অন্যদিকে গিরীশ ঘোষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাই তাঁর গানে যে শক্তি, যে সত্য, যে সৌন্দর্য, যে রস ফুটিয়াছে, মধুসূদনের গীতিতে তাহা ফোটে নাই'। গিরীশ ঘোষের কি ভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল জানা নেই। বিপিনচন্দ্র আরও লিখছেন—'কিন্তু আমি যখন ব্রজাঙ্গনা পড়ি তখন একাল ভাবি না। আমি দেখি তার সুর। আমি দেখি তার শব্দ সম্পদ। আমি দেখি তার ছন্দ। আমি মজিয়া যাই তার অপূর্ব ঝংকারে। এই ঝংকারটি বড় মিষ্ট। তারই জন্য ব্রজাঙ্গনাকে এমন মিষ্ট বলি। তুমি খোঁজ শব্দ নয় অর্থ। তুমি চাও ছন্দ নয়, রস। এই জন্যই আমার যা মিষ্ট লাগে, তোমার তাহা মিষ্ট লাগে না'। কবিতা পাঠকের মানসিকতার বিভিন্নতার দরুণ, একই কবিতা প্রত্যেকের ভাল বা মন্দ লাগতে পারে না। বিপিনচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত না হয়েও, তাঁর কাব্য বিশ্লেষণে পরস্পরবিরোধী মতের প্রাধান্য লক্ষণীয়। 'সঙ্গীতে বিজ্ঞান' নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। শব্দ, কম্পন, তরঙ্গ আকৃতি, কানের অভ্যন্তরস্থ গঠন প্রণালী, সা রে গা মঃ পা ধা নি—এই সপ্তকের মধ্যে সাতটি স্বরের কম্পনের অনুপাত ইত্যাদি সম্পূর্ণ নতুন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধকার শিশিরকুমার মিত্র দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। পূর্বে অনুল্লিখিত আর একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ হল 'নবীনচন্দ্রের শৈলজা'। 'শৈলজা' নবীনচন্দ্রের নিজস্ব মানস-দুহিতা। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস—এই তিনটি পৃথক কাব্যগ্রন্থ বা একত্রে অখণ্ড মহাকাব্যের ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে কি ভাবে নাগরাজ চন্দ্রচূড় কন্যা শৈলজার চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে লেখক জীবেন্দ্রকুমার দত্ত তাই দেখিয়েছেন। নারায়ণে প্রকাশিত বিষয়ের এই গুরুগম্ভীরতার পাশে দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গ কবিতা সহজেই মন আকৃষ্ট করে। 'গিন্নী' শীর্ষক এই কবিতাটির রচয়িতা দরবেশ ছদ্মনামের আড়ালে কোন বিশিষ্ট কবি। আমি ব্যক্তিগতভাবে কবিতাটি প্রথম শুনি স্বর্গত কবি নরেন্দ্র দেবের কাছে। তাঁর পরিহাস রসিক মনের সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। আমার ধারণা দরবেশ নামের আভাসে কবি নরেন্দ্র দেবই ছিলেন। অবশ্য তিনি নিজে কখনও এ দাবী করেন নি। কবিতাটি থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা অসম্ভব।

গিন্নী তুমি হে আমার সর্ব ;
উদ্যতফণা জাগ্রত সদা নাশিতে সকল গর্ব।

…তুমি হে আমার সান্ধ্যভ্রমণে ছড়ির আকারে ছাতা,
দুপুরের ধূপে, বরষার ঝুপে খুঁজেও মিলে না কোথা।
…তুমি হে আমার আয়েসের কালে রবিঠাকুরের কাব্য,
কত যে হেঁয়ালী কিছুই বুঝি না পড়িয়া যেতেছি দিব্য।
বঙ্কিম তব বঙ্কিম রসে শঙ্কিত হয়ে অতি
আসমান-ছাঁকা আসমানী রূপে করেছে তোমারে নতি।
তব হাসিমুখ, যখন আমার বাক্যেতে ঝন্ঝন্
প্রলয়মূর্তি তখনি তোমার, যবে করে ঠন্ঠন্।
…এস এস প্রিয়ে, ভুবন ছাপায়ে, এস হে সন্নিকট
তুমি আমি দুই, সংসারে সঙ, মঞ্চশেষের ফট।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র-জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'নারায়ণ' পত্রিকা ও চিত্তরঞ্জন প্রসঙ্গে লিখছেন—'ব্রাহ্মধর্মের মতবাদ, ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিবাদ সমালোচনাই হইল এই পত্রিকার প্রধান কার্য। চিত্তরঞ্জন নারায়ণ পত্রিকা বাহির করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার লিখিবার সময় কোথায় ? তিনি তো তখন হাইকোর্টের প্রধান ভারতীয় ব্যারিষ্টারদের অন্যতম। তাই তিনি অর্থ দিয়া কয়েকজন প্রতিভাশালী লেখককে এই কার্যে নিযুক্ত করিলেন ; ইহাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল স্বনামধন্য'। যদিও নারায়ণ পত্রিকায় হিন্দুধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ প্রাধান্য পেয়েছিল, ভাষা ও কবিতার প্রশ্নে প্রথম চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখগণ নারায়ণ কর্তৃক আক্রান্তও হয়েছিলেন, তথাপি ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশ্য বিরোধিতামূলক প্রবন্ধ নারায়ণে চোখে পড়ে না। লেখবার সময়ও চিত্তরঞ্জনের ছিল। নারায়ণের প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই চিত্তরঞ্জনের লেখা প্রকাশিত হত। লেখক ভাড়া করার যে কারণ শ্রীমুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখিয়েছেন তা ভুল এবং আদৌ কোন লেখক ভাড়া করা হয়েছিল কি না সে সম্পর্কে কোথাও কোন প্রমাণ চিত্তরঞ্জনের জীবনী গ্রন্থগুলিতে নেই। বিপিনচন্দ্র 'নারায়ণ' পত্রিকা পরিচালনায় চিত্তরঞ্জনের অন্যতম সহায়ক ছিলেন—এ কথা অবশ্য স্বীকার না করে উপায় নেই।

কাঁথির করণ সমাজ

পূর্ণচন্দ্র দাস

যেকালে সমাজে জীবিকা ভিত্তিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল সেকালে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের জীবিকায় হস্তক্ষেপ করাকে পাপ বা অন্যায় বলে মনে করতেন। কবে থেকে এই নিয়ম চালু হয়েছিল সে কথা ঠিক বলা না গেলেও করণিক বৃত্তির মাধ্যমেই যে সেই একই সময়ে করণ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। সেবাকে ধর্ম বলে মনে করে যে সব মানুষ সমাজ সেবায় নিজেদের বিলিয়ে বিকিয়ে দিয়েছিলেন কালক্রমে তাঁরাই সেবক বা দাস বলে ঘৃণ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে উঠলেন সমাজের কাছে। বিদ্যা ও বুদ্ধির একত্র সমাবেশে করণ সম্প্রদায় হয়ে উঠলেন সমাজের সর্বেসর্বা। গানে, গল্পে, ছড়ায়, ধাঁধায় সব সময় পল্লী মুখরিত হয়ে থাকতো করণ সম্প্রদায়ে গুণগানে। কখনও বা তাঁরা নিজেরাই মুখর হয়ে উঠতেন নিজেদের আত্মশ্লাঘায়।

চারি চৌদ্দ উপর চার,
গিরি যাইচন লই সেপার,
যদি তু করণ পুতন হবু,
গিরি নাম ধরি ডাকি আনিবু।

চারকে চৌদ্দ দ্বারা গুণ করে, গুণফলের সঙ্গে চার যোগ দিলে ষাট হয়। সংস্কৃতে ষাটকে ষষ্ঠী বলে। ষষ্ঠী গিরি নদীর ওপারে গেছেন। আগন্তুক গৃহস্থামীর নাম ও তিনি কোথায় গেছেন এই কথা জানতে চাওয়ায় গৃহ কর্তার প্রতিভূ আগন্তুকের পরিচয় ও তিনি যে করণ সম্প্রদায়ের একথা জানতে পেরে উপরোক্ত ধাঁধাটি বলেন। আর বলেন যদি তুমি করণের ছেলে হও তবে গিরির নাম ধরে ডেকে আনবে।)

সত্যই এককালে করনিকজ্ঞান না থাকলে নিজেকে করণ বংশীয় বলে পরিচয় দেওয়ায় অনুপযুক্ত বলে গণ্য হতো।

করণ সম্প্রদায়ের চারিটি শাখা। কৃষিজীবী, মসীজীবী, লাউলী ও করণ পদবী ধারী করণ। উড়িষ্যার করণ, বাংলার কায়স্থ ও বিহারের লালা, স্থান ভেদে নামের পার্থক্য ছাড়া সকলেই একই গোষ্ঠীভুক্ত বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু সন্ধানীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় এঁদের মধ্যে জীবিকার সাম্যতা থাকলেও সামাজিক সংস্কৃতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। লাউলী শাখার করণদের উপনয়ন হয় ব্রাহ্মণদের মত। করণ ও কায়স্থদের মধ্যে জন্মাশৌচ একুশ সূর্যে ত্যাজ্য হলেও বিবাহের বেলায় মঙ্গল বিয়েকে বাদ দিলে, বিয়ে, বাসি-বিয়ে, ফুল-শয্যা বা বৌভাত—এই তিন দিনে বিবাহ উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে, কিন্তু করণদের বিবাহে অষ্ট মঙ্গল রুক্মিনী মত। আট দিন চলে বিবাহ উৎসব। আবার মৃতাশৌচ পালনের বেলায় করণদের দশ সূর্যে পবিত্র আর কায়স্থদের চলে একমাস।

করণ জাতির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে দুর্গাদাস লাহিড়ি সম্পাদিত 'পৃথিবীর ইতিহাস' থেকে জানা যায় যাঁহারা যথা সময়ে উপনয়ন সংস্কার না করেন তাঁহাদের ব্রাত্য বলে। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সবর্ণা

গর্ভজ তনয় দেশে বিদেশে সপ্তবিধ আখ্যা পাইয়া থাকে। ঝল্ল, মল্ল, লিচ্ছবি, নট, করণ, খশ, দ্রাবিড়। করণ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মনু সংহিতায় দেখা যায় 'উহারা ব্রাত্যক্ষত্রিয়।' আবার অনেকে বলেন এঁরা চিত্রগুপ্তের (যম রাজের হিসাব রক্ষক) বংশধর, ব্রহ্মার চক্ষু হইতে জাত। করণ পদবীধারী করণদের সঙ্গে উড়িষ্যার করণদের সামাজিক সংস্কৃতির কোন মিল নাই বললেও অত্যুক্তি হয় না—

সম্ভবত খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নিম্নবঙ্গের হিজলী অঞ্চলে উড়িষ্যা থেকে করণরা প্রথম আগমন করেন। এই শতকেই স্বনামধন্য মসনদ আলির আবির্ভাব। তাঁর অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ জনমানসে বিশেষ রেখাপাত করে। মসনদ আলিকে স্থানীয় লোকেরা 'বাবা মেছেন্দালী' বলেন। হিজলীতে তাঁর রাজধানী ছিল। তিনি কুলাপড়ার হরি সাউর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর বেশ-ভূষার কোন পারিপাট্য ছিল না। বাংলা দেশের নক্‌সা কাটা কাঁথা গায়ে দিয়েই ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর সম্বন্ধে এখনও নানা রকম লোক সঙ্গীত গীত হয়।

'চারিদিকে পুনাপানি—
মধ্যেতে হিজলী।
তার মধ্যে বাস করেন—
বাবা মেছেন্দলী।
ফকির আইলরে আইলরে
ছিঁড়া কাঁথা গায়।'
হরি সাউ নামে তিলি
কুলা পাড়ায় ঘর
তার কন্যা রূপমতী
দেখতে মনোহর।
দিনান্তে জোটে না ভাত
তেল বেচে তিলি
তার কন্যা বিভা করেন
বাবা মেছেন্দালী
ফকির আইলরে আইলরে
ছিঁড়া কাথা গায়।'

মসনদ আলির কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমিত বিক্রম সেকেন্দর আলি অগ্রপত্তন (এগ্রা) থেকে হিজলী পর্য্যন্ত বিরাট নিম্নাঞ্চল কৃষি ও বসবাস উপযোগী করে তুলেন। পাঁঠ (চুবদা বেসিন) থেকে সমুদ্র কুল পর্য্যন্ত বিরাট বাঁধ মেছেন্দলী সাহেবের ভ্যাড়া বলে পরিচিত। তাঁর রাজধানী পূর্বে জুনপুট পশ্চিমে অগ্রপত্তন, উত্তরে মহিষাদল, দক্ষিণে সমুদ্র। সেকেন্দর আলির লোহার ছড়ি এখনও হিজলীর বাবা সাহেবের কোট গোড়ায় সুরক্ষিত। প্রবাদ আছে আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে ভক্তি না করে কেহ যদি অহমিকা প্রকাশ করে এই ছড়ি তুলতে যায় তাহলে সে কিছুতেই এই ছড়ি তুলতে পারবে না। মসনদ আলি তাঁর রাজধানী দেখাশুনার জন্য প্রথম তাঁর দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্রকে

উড়িষ্যা থেকে আনেন। ভীমসেন মহাপাত্রের দুই কন্যা ছিলেন। দেওয়ানজী মেয়ে দুটিকে বিয়ে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত করণ পাত্র না পেয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে তিনি পরগণে বাহিরি মুঠায় ভীম সাগর নামে বিরাট পুকুর কেটে পুকুরের মধ্যে দেউল প্রতিষ্ঠা করেন, ও এই দেউলের মধ্যেই সজ্ঞানে জীবন্ত সমাধি গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল ঐ পুকুরে কেউ নাবেনি তাই জনসাধারণের অজ্ঞাত ছিল। বর্তমানে ভীম সাগরের তীরে বাহিরী হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় পুকুরটি সংস্কার করতে গিয়ে সমস্ত ইতিহাস জনসাধারণের গোচরে আসে। ভীমসেন মহাপাত্র মৃত্যুর পূর্বে তাঁর গর্গ উপাধিধারী দরোয়ানকে মহিষাদলের জমিদারী দান করেন। আর বাকি পঁচিশটি পরগণা দান করেন রাঁধুনী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ পাণ্ডাকে। কৃষ্ণ পাণ্ডা ভীমসেন মহাপাত্রের খানসামা ঈশ্বরী পট্টনায়ককে সুজামুঠা ইত্যাদি বারটি পরগণা দান করেন। জলামুঠা ইত্যাদি তেরটি পরগণা তিনি নিজে রাখেন। ঈশ্বরী পট্টনায়ক তাঁর জমিদারীর কাজ পরিচালনা করার জন্য গড়বাড়ী করেন কিশোর নগরে। বর্তমানে কিশোর নগর গড়ের উত্তরাধিকারী মিত্ররা ঈশ্বরী পট্টনায়কের দৌহিত্র। কৃষ্ণ পাণ্ডা তাঁর জমিদারী পরিচালনার জন্য গড়বাড়ী স্থাপন করেন বাসুদেবপুরে। জমিদারী দেখাশুনার জন্য তিনি তাঁর নিজ পিতৃভূমি উড়িষ্যা থেকে চারটি করণ পরিবারকে উড়িষ্যা থেকে নিয়ে আসেন। এই লেখকের পূর্বপুরুষ স্বনামধন্য ৺বংশীলোচন দাস বকসীর পদে ও অপর দুইজন ব্যবর্তা ও মুন্সীর পদে বহাল হন। (বকসী (হিসাব রক্ষক) ব্যবর্তা (ব্যবস্থাপক) মুনসী (শিক্ষক)) খাস নবীশের পদ অলঙ্কৃত করেন যিনি তাঁর পুরুষ ছিলেন রনজিত মহাপাত্র দাঁতনের কাছে রাইবনিয়া গড়ের রাজা, তিনি বিয়ে করেছিলেন ষোলটা। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি দেহত্যাগ করেন। ষোলজন স্ত্রী রনজিত মহাপাত্রের মৃত্যুর পর যে যার বাপের বাড়ী চলে যান। দাস পদবী সম্ভবত সমগ্র ভারতবর্ষেই ছিল না—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরেই 'ঈশ্বরের দাস' এই ভাবোন্মাদনায় নিজ নিজ পদবীর পরিবর্তন করেন।

আগেকার দিনে যেমন দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিষ্কর দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল করণদের জন্যও ঠিক তেমনি নিষ্কর 'করনি মহাত্রাণ', ভূমির ব্যবস্থা ছিল।

কৃষ্ণ পাণ্ডা এই করণ পরিবারগুলির নিষ্কর করণি মহাত্রাণ ভূমির ব্যবস্থা করেন।

কৃষিজীবি করণরা কৃষিকাজের জন্য হল কর্ষণ করেন ও ঘরের এঁড়ে বাছুরকে নির্বীর্য করে বলদে পরিণত করেন। এছাড়া লাউলী ও মসীজীবিদের সঙ্গে এঁদের কোনও সাংস্কৃতিক পার্থক্য নাই। স্থানীয় লোকেরা কৃষিজীবি করণদের 'উড়িয়া' বলেন। কাগজে কলমে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে এঁরা করণ বলেই উল্লেখ্য হন।

বাক্যের মাঝখানে পদগুলি যেমন অর্থপূর্ণ—সমাজের মাঝখানে পদবীগুলিও তেমনি অর্থপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ ইতিহাস বহন করে। শিক্ষক যদি সমাজের শ্রেষ্ঠ সমাজবন্ধু হন তবে করণ সমাজই বর্তমান শিক্ষাধারার প্রবর্তক। বর্তমানকালের স্কুলগুলি আমাদের ছেলেবেলায় পাঠশালা নামে অভিহিত ছিল। শিক্ষক মহাশয়রা মাহাতি নামে পরিচিত হতেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে এই মাহাতিই মাইতি (Maity) নামে পরিচিত হতে থাকের। উড়িষ্যার মহাস্তি পদবীধারী করণেরা শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী ছিলেন। মহাতি এই মহাস্তি শব্দ থেকেই রূপান্তরিত। হিন্দু রাজত্বকালে রাজার প্রধান

উপদেষ্টা বা প্রধান মন্ত্রী করণ সমাজের মহাপাত্র পদবীধারীদের পূর্বপুরুষ। মহা-নায়ক বা প্রধান সেনাপতি করণ সমাজের নায়ক ও পট্টনায়কদেরই আদিপুরুষ। বলে-বিক্রমে বিদ্যা-বুদ্ধিতে মুসলমানদের বিতাড়িত করে এঁদের মধ্যেই অনেকে রাজা হয়ে রায় পদবী গ্রহণ করেন। চৈতন্য যুগে এই করণ সমাজেরই কেউ কেউ মঠের সেবায়েত হয়ে, দাস, অধিকারী, দাস-অধিকারী···ইত্যাদি পদবীতে নিজেদের পদবী রূপান্তরিত করেন। মুসলমান রাজত্বের ডামা-ডোলার সময় দু একজন করণ নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করে ভূঁঞা উপাধি ধারণ করেন।

সমাজ উন্নয়নে করণ সম্প্রদায়ের অবদান একান্ত স্মরণীয়। উপকারী পশুবলে গরু হিন্দুসমাজের কাছে দেবতার স্থান পেয়েছে। মূল্যায়নে গরু একটি সম্পদ। এই গো সম্পদের উন্নতির জন্য করণ সমাজ এখন তাঁদের বাড়ীর এঁড়ে বাছুরকে নির্বীর্য করে বলদে পরিণত করেন না। মহাদেবের নামে ত্রিশুল চিহ্নিত করে ছেড়ে দেন। 'গো বীজ হস্তার রৌরব নরকেও স্থান নাই!' এই ধারণা হিন্দু করণ সমাজের ধর্মীয় সংস্কৃতির মূল কথা। গাঁয়ে এখনও কোন ছেলে যদি কোন কাজ করতে না পারে বা করে না বা কথা শোনে না তখন তাকে বলে 'করণ ঘর ষঁড়', (করণের বাড়ীর ষাঁড় যেমন কোন কাজ করে না খায়-দায় ঘুরে বেড়ায় সেই রকম।) বলে তিরস্কার করেন।

এখনও যদি পাড়ার একজন আর একজনকে তার অমনোনীত বা অবাঞ্ছিত উপদেশ দিতে আসেন তবে শ্রোতা তার উপদেষ্টাকে বলেন, 'করণ ষাঁড় আইলে' (করণ সমাজপতি এলেন।) বলে শ্লেষোক্তি করেন। করণরা সাধারণতঃ রাজবাড়ী বা জমিদার বাড়ীতে করণিকের কাজে নিযুক্ত থাকতেন। গ্রামের প্রজা সাধারণের উপর কার্যত তাঁদের একটি প্রচ্ছন্ন আধিপত্য থাকতো। করণ সমাজপতিরা কখনও সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করতেন না। সমাজের জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ বা তাঁদের অভাব অভিযোগ মেটানোর কাজে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ করতেন। তাছাড়া জমিদারের মাধ্যমে গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য বড় বড় পুকুরণী খনন, জল-নিকাশ ও চাষ-বাসের সুবিধা সুযোগ করানো, নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পুরাতন রাস্তার সংস্কার প্রভৃতি জনহিতকর কাজগুলির সুব্যবস্থা করাতেন। এর দ্বারা লোকের জীবিকা অর্জনের পথও সুগম হতো।

গ্রামে বুদ্ধিমত্তার দুর্বোধ্য চাল-চলনকে 'করণিয়া' চাল বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এককালে মন্ত্রীত্বের বিদ্যা করণদেরই অধিগত ছিল। 'মন্ত্রগুপ্তি বা ষড়কান মন্ত্রভেদ', বিদ্যায় করণদের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ বা গুপ্তচর বৃত্তিতে করণরা ছিলেন একচেটিয়া। তাঁদের চাল-চলন ও কথাবার্তা প্রায়শঃ চাণক্য-নীতি পরিচালিত ছিল। মন্ত্রভেদ করা ছিল দুরূহ। গোপনীয় সংবাদ চারিটি কাণ ছাড়া ছয়টি কাণে পরিবেশিত হত না।

মোগল পাঠান হন্দ হ'লো, পারসী পড়ল তাঁতী।
বাঘ পালাল বিড়াল এল, শিকার করতে হাতী॥

আবার চাকা ঘুরলো, মুসলমান রাজত্বের অবসান হল, ইংরাজ রাজত্ব শুরু হল। পারসী ছেড়ে আবার ইংরাজী অনুকরণের পালা—যে পারসী ভাষা একদিন অন্দরে, অন্তরে, বাহিরে দৈবাদুগ্রহছিল পিতামাতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন, জামাতা ও পুত্র এরা সব যেন পারসী বিশেষজ্ঞ হন। কন্যার প্রার্থনা ছিল সমস্ত দেব-দেবীকে এড়িয়ে তার প্রতিবিম্বিত হওয়ার আশির কাছে। 'আরশি!

আরশি! আমার বর যেন পড়ে পারশি।' বিপরীত ধর্ম স্রোতে সব ভেসে গেল। জমিদারী সব হয়ে গেল কোট অফ ওয়ার্ড, রাজাদের রাজকীয় প্রতাপ ও চাল-চলন সব গেল তলিয়ে। কত লোক খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন, ইংরাজী নবীশ হলেন। গাড়ী, বাড়ী, ব্রাডপ্রেসার নিয়ে কুলীন হয়ে উঠলেন। করণিক বৃত্তি হারিয়ে করণ হল আপনহারা কিন্তু হারাতে চাইল না তার অধিকার। যে বিদ্যা, শৌর্য, দাক্ষ, বল ও ধৈর্য্য এই পঞ্চমিত্রকে অবলম্বন করে তাঁদের পূর্ব-পুরুষেরা একদিন সমাজে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি আদায় ও আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন উত্তরাধিকারীরা পরবর্তীকালে সেই সব সদগুণ হারিয়ে প্রভুত্বের আকাঙ্খায় অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়কে অত্যন্ত হীন চোখে দেখতে লাগলেন। পূর্বপুরুষের মাহাত্ম্য বজায় রাখার চেষ্টা না করে তার ঐতিহাসিক স্মৃতি পর্যন্ত ভুলে গেলেন। এক প্রতিভা শূণ্য অনুকরণ শুরু হল। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাভাবিক গতিস্রোত গেল হারিয়ে মানুষকে ছোট করে সমাজকে করল বড়। দীর্ঘকাল অনায়াস লব্ধ জীবিকার ফলে পরিশ্রম করার ক্ষমতা পূর্ব হতেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মসীজীবী ও লাঙলী করণের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যতা ছিল এই যে তাঁরা, হল কর্ষণ করতেন না, ঘরে এঁড়ে বাছুরকে নিবীর্য করতেন না। মাথায় বা বাঁকে করে মোট বহন করা বা কারুর বাড়ীতে মজুর খাটা তাঁদের সামাজিক নিষেধ ছিল। এমন কি কারুর মাথায় বোঝা তুলে দিলেও সামাজিক অচল হতেন। কৃষিজীবী ও লাঙলীদের কস্তার আদান প্রদান ও হুঁকোর চল ছিল না! জীবিকাহীন সম্প্রদায় সামাজিক ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে পূর্বসঞ্চিত সম্পদ সব হারিয়ে অনেকে পৈতৃক ভিটে-মাটি বিক্রি করে দূর দেশে হীন জীবিকা অর্জন করতে শুরু করলেন—সমাজ তাতে বড় হল না নিষ্ফল হয়েগেল।

ব্রত উৎসব— কুমার পূর্ণিমা থেকে রাস-পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাস চলে কার্ত্তিক ব্রত। করণ সম্প্রদায়ের বিধবাদের এই ব্রত অবশ্যই কর্তব্য। যাঁরা ব্রত করেন তাঁরা প্রত্যেকদিন প্রাতঃস্নান ও হবিষ্যান্ন করেন। প্রাতঃস্নানের পরেই তুলসী পূজা করা হয়। প্রথমে তুলসী তলায় দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বারো আঙুল পরিমিত একটি চৌকো গর্ত খোঁড়া হয়। এটিকে পুকুর কল্পনা করে এর পাড়ে একটি গোবরের শিব তৈরী করে তার মাথায় একটি নতুন ধানের শিষ গুজে দিয়ে বসিয়ে দেয়। এরপর শিবের কাছে গণেশাদি পঞ্চদেবতার কল্পনায় পাঁচটি বালির পিণ্ড করে পিণ্ডগুলি ও শিবকে ফুল চন্দন ফল মূল সহ পূজা করে। পূজার শেষে একটি থালায় পাঁচ মুঠো আতপ চাল এবং হরতকী, বিভিতকী, আমলকী, নারিকেলের গুটি ও সুপারী এই পাঁচ রকমের পাঁচটি ফল রেখে তার উপর একটি প্রদীপ জালিয়ে দেওয়া হয়। ব্রতীরা এই থালাটিকে ধরে সূর্য বন্দনা করেন। বন্দনার সময় যে সমস্ত ছড়া বলেন সেই সমস্ত ছড়াগুলিতে সূর্যরূপী বিষ্ণুর রথের গতি ও প্রত্যেক দেবপুরীতে তাঁর উপস্থিতি আর সেখানকার মেয়েরা এই রথকে যে সাদর অভ্যর্থনা জানান সেই কথা রয়েছে। প্রথম বন্দনার ছড়ায় রথের কৈলাস নগরীতে যাত্রা :—

'রথ সাজ রথ সাজ পড়িগলা গুল,
রথ যাই লাগিলা সে কৈলাস নগর।
কৈলাস নগরে যেতে নারী ম্যালে ধিলে,
পঞ্চ মাণিক দেই রথ বন্দ্যাইন লেলে।'

ছড়াটির অর্থ—রথ সাজাও রথ সাজাও বলে হৈ হুল্লোড় পড়ে গেল। রথ কৈলাস নগরে উপস্থিত হল ও সেখানকার মেয়েরা পাঁচটি মাণিক দিয়ে প্রণাম করে অভ্যর্থনা জানালেন।

পর পর বৈকুণ্ঠপুরী, ইন্দ্রপুরী, কুবের নগর প্রভৃতিতে যাওয়ার সময় কেবল গন্তব্য স্থলের নামের পরিবর্তন হয়, আর সব ছত্র একই থাকে। বন্দনার পর চলে অর্ঘ্য। অর্ঘ্যর ছড়াগুলিতে গঙ্গাজল ও হরিতকী বাদ দিয়ে সব কিছুই অপবিত্র দেখান হয়েছে। দুধ বাছুরের এটো, গুড়ে পিপড়ের এটো ও ফল বাদুরের এঁটো।

ছড়াটি :—

দুধ দেই অর্ঘ্যস্থানে বাছুরি ওঁইঠা, (এঁটো)
গুড় দেই অর্ঘ্য স্থানে পিপিড়ি ওঁইটা,
ফল দেই অর্ঘ্য স্থানে বাদুড়ি ওঁইঠা,
গঙ্গাজল, কষাফল সবুহ পদিষ্ঠা। (পবিত্র)

ছড়াটি বলার পর গঙ্গাজল ও হরিতকী দিয়ে জোরে জল ঢেলে দেওয়া হয়। বালির পিণ্ডসহ সবকিছু ধুয়ে মুছে পড়ে সেই কল্পিত পুকুরে। এই নিয়ম সারা মাস চলে।

কুমার বা কার্তিক ব্রতের শেষের পাঁচ দিনের ব্রতকে পঞ্চক ব্রত বলে। মাসের পচিশ দিন হবিষ্যান্ন করলেও শেষের এই পাঁচদিনের শাস্ত্রীয় উপবাসের ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠিন। একাদশীতে গোময়, ত্রয়োদশীতে ঘৃত, চতুর্দশীতে দধি ও পূর্ণিমায় দুগ্ধ পান করার নিয়ম। বর্তমানে এইসব নিয়ম পালন করতে না পারলেও ভাত একেবারে বন্ধ। ব্রতীরা কেবল ফল মূল খেয়ে থাকেন। পুরোমাস কার্তিক মহাত্ম্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে শেষের পাঁচদিন পঞ্চক মহাত্ম্য পাঠ হয়।

মেয়ে, মা, শাশুড়ী, বউমা এমনকি ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরাও এই পঞ্চক ব্রতে উৎসাহী। এক কথায় গৃহস্থের প্রায় সব মেয়েই পঞ্চক ব্রত করেন। একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচ দিন চলে পঞ্চক ব্রত। 'সধবার একাদশী' যদিও ব্যাঙ্গোক্তি তবুও পঞ্চক একাদশীতে সধবার একাদশীতে দোষ নেই। পঞ্চকের প্রথম দিনের গল্পটি 'একাদশী মাহাত্ম্য'। এটি অনেকটা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গবাসের মত। একাদশীর পুণ্যের ফলে কাঞ্চীপুরের রাজা সুবাহু ও তাঁর রাণী সশরীরে স্বর্গের পথে যেতে হঠাৎ রথ অধোগামী হয়ে মল্ল রাজ্যের মধ্যে অবতরণ করে। এমন সময় দৈববাণী হয় একাদশী করেছেন এমন কেউ রথটাকে স্পর্শ করলে রথ আবার উপরে উঠতে পারে। ঐ রাজ্যের জয়ন্ত সদাগরের সাত ছেলের সাত বউর মধ্যে অনাচারী ছিল ছোট বউ। তাঁরা তাকে একাদশীর দিন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন সে বনের মধ্যে কোনও প্রকার খাদ্যের যোগাড় করতে না পেরে একটু জল খেয়ে দিন কাটিয়েছিল। একাদশীর দিন উপবাসী ঐ বউ রথ ছোয়া মাত্রই রথ আবার উর্ধ্বগামী হয়ে স্বর্গে পৌছাল। অজ্ঞাতসারেও যদি কেউ একাদশীতে উপবাস করে তাতেও মুক্তি আছে, এই হল মূল বক্তব্য। বাকি চারটি গল্প সবগুলিই পঞ্চক ব্রতের সম্বন্ধে। আসল কথা পঞ্চক ব্রত করলেই মুক্তি।

কার্তিক মাস ধর্মের মাস। পিণ্ড বা ভোজ্য দিয়ে মহালয়ার দিন যে সমস্ত পিতৃলোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাঁদের যেন অন্ধকারে কষ্ট পেতে না হয় তার জন্য 'স্বর্গদীপ' (আকাশ প্রদীপ)

ব্যবস্থা। একটি হাঁড়িকে পিটুলীর জলে সাদা করে নিয়ে তার চার দিকে ছোট ছোট ছিদ্রকরে, যাতে হাঁড়ির ভিতর থেকে আলো বাহিরে বেরিয়ে আসতে পারে। গায়ে দেয় স্বস্তিকা চিহ্নের আলপনা। হাঁড়ির মধ্যে আতপ চালের তুঁষ দিয়ে তার উপর একটি প্রদীপ জালিয়ে দেওয়া হয়। হাঁড়ির উপরে একটি সরাকেও ঐ রকম রাঙিয়ে ঢাকা দেয়। তুলসী মঞ্চের কাছে একটি লম্বা বাঁশ পুঁতে হাঁড়িটাকে দড়ি ও সিকের সাহায্যে কপিকলের মত ব্যবস্থায় উপরে বাঁশের ডগায় তুলে দেওয়া হয়। সারা মাস এই স্বর্গদীপ দেওয়া হয়। মাসের শেষে পুরোহিত ঠাকুর দড়ি, হাঁড়ি, সরা, বাঁশ সব বিসর্জনী ব্যবস্থায় গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে একটি সিদে (একজনের আহার উপযোগী চাল, ডাল তরি-তরকারী, লবণ ইত্যাদি) বাড়ী নিয়ে যান। এটি করণদের একটি কুলধর্ম। এই ব্যবস্থা আসলে বংশে বাতি দেওয়া ব্যবস্থা।

'গয়ায় না হয় পয়ায়।' তর্পণ পক্ষের পনের দিন তিলতর্পণ করে মহালয়ায় শ্রাদ্ধ দিতে হয়। তর্পণ পক্ষশুরু থেকে পিতৃপুরুষ স্বর্গথেকে নেমে আসেন মর্তে। ক্ষমতা বা সুবিধা থাকলে মহালয়ায় গয়ায় পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ দিতে হয় না পারলে দীপান্বিতায় শ্রাদ্ধ দিতে হয়। পিতৃপুরুষ এই শ্রদ্ধার অর্ঘ গ্রহণ করে পুনরায় স্বস্থানে গমন করেন। দীপান্বিতা অমাবস্যাকে 'পায়াজালা উঁয়াস ; বলে। একে ভূতঅমাবস্যাও বলে। ঐ দিন হয় অলক্ষীপুজা বা ভূত পুজা। এই কারণে এর নাম ভূত-অমাবস্যা। সকালে হয় চতুর্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধ আর অলক্ষ্মী পুজা। যেখানে ঘরের চালার জল পড়ে সেই জায়গাটাকে বলা হয় 'উলচাগাড়ি'। উলচাগড়িতে হয় পুজার অনুষ্ঠান। ভাঙা ধুছুচি, ভাঙা কুলো, ভাঙা চুপড়ি এগুলো হয় বাদ্যযন্ত্র। ভোগ বা ভোজ্য হয় কলার খোসা, পানীয় হয় ব্রাহ্মণের পা-ধোওয়া জল। পুজোয় প্রদীপ জালানোর পরিবর্তে পাট-কাঠি জালায়। রাত্রের বেলায় পুকুরের চারদিকে পাট-কাঠির ছোট ছোট আঁটি জালিয়ে পুঁতে দেয়। বিসর্জনের সময় বলা হয় 'লক্ষ্মী আইলা অলক্ষী পলা'-এর অর্থ—লক্ষ্মী এসেছে, অলক্ষ্মী পালাও।

ডাক-সংক্রান্তিতে স্বর্গদীপ জালানোর দিন যেমন সাত-শাকের (সাত রকম শাকের) ভাজা খেতে হয় তেমনি দীপান্বিতার দীপ নেবানোর দিনও চৌদ্দ শাকের ভাজা খেতে হয়।

শ্যামা পুজার পরের দিন 'দর্পণ দর্শন' উৎসব, একে বলে পড়িয়ান। পড়িয়ানের দিন নরসুন্দরেরা কাংস-দর্পণ দেখিয়ে কাপড়, জামা, পয়সা ইত্যাদি বখশিশ আদায় করে। ছোট শিশু থেকে আরম্ভ করে আশি বছরের বুড়ো পর্যন্ত সকলকেই দর্পণ দর্শন করতে হয়। এই কাংস দর্শন দেখলে নাকি পরমায়ু বাড়ে পুর্বস্মৃতি জেগে ওঠে। পড়িয়নের দিন কাক ডাকার আগে অন্ধকার থাকতে থাকতে ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো জালিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের গায়ে হলুদ মাখানো হয়, ভোর হতে না হতেই কপালে চন্দনের ফোঁটা, চোখে কাজল, ভ্রূর দক্ষিণ প্রান্তে 'রক্ষা টিপ' নিয়ে, পোড়া পিঠে খেয়ে বেরিয়ে পড়ে পাড়ায়। কে আগে সেজেছে, কার সাজ-সজ্জা ভাল হয়েছে দেখানোর জন্য। কাক ডাকার আগে না সাজলে কাক সব রূপ হরণ করে নেয়, লোক প্রবাদ। বাড়ী থেকে বেরোবার আগে মা, বাঁ হাতের কেড়ে আঙুলটি কামড়িয়ে উদ্দিষ্ট করে দেন, পাছে ছেলের উপর লোকের কু-দৃষ্টি পড়ে। ঐদিন হলুদ গায়ে দিয়ে গা থেকে যে ময়লা বের হয় সেই ময়লা বা মলকুটি দুর্বোঘাসের উপর ফেলা হয়। ধারণা এই ব্যবস্থায় ছেলের স্বাস্থ্যও দিনে দিনে কচি দুর্বোর মত

সুকোমল ও নধর হয়ে উঠবে।

ডাক-সংক্রান্তি ও পড়িয়নের দিন পোড়া-পিঠে অবশ্যই করণীয়। আতপ চালের গুড়ো একটা বড় কড়াইতে দিয়ে উনানে চাপিয়ে নাড়তে হয়, যতক্ষণ সেটি ভালভাবে শুকিয়ে না যায় ততক্ষণ। তারপর সেটি একটি বড় থালায় ঢেলে গরম জল দিয়ে আটা মাখার মত মেখে নেয়। একে বলে 'থলিকাড়া'। প্রথমে একটি কড়ার মধ্যে কলাপাতা পেতে নিয়ে তার উপরে এই থলি দিয়ে বেশ করে চেপে দেয়। তার উপর আবার কলাপাতা দিয়ে এই কলাপাতার উপরে কাঠ কয়লার আউরা বা আগুন ঢেলে দিয়ে কড়াইটিকে উনানের উপর বসিয়ে দেওয়া হয়। কড়াইয়ের তলায়ও থাকে আগুন উপরেও থাকে আগুন। মৃদুমন্দ আগুনে পিঠেটি সু-সিদ্ধ হয়। দক্ষ কারিগর না হলে আগুনের মাপ না জানলে হয় পিঠে বেশী পুড়ে যায় অথবা কাঁচা থেকে যায়।

পড়িয়ন উৎসবের ঠিক সাত দিন পরেই 'পড়ুয়া অষ্টমী', পড়ুয়া শব্দের অর্থ প্রথম। বাপ-মায়ের প্রথম সন্তানের এই তিথিতে জন্মোৎসব পালন করে, জাতকের গায়ে হলুদ মাখিয়ে মাথায় চন্দনের ফোঁটা দিয়ে হলুদ রঙের জামা কাপড় পড়িয়ে সাজানো হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে কল্পনা করে তিনটি গোবরের মূর্তি তৈরী করেও এই মূর্তিগুলির মাথায় নতুন ধানের শিষ গুজে দেয়। এদিনও লক্ষীপুজা করা হয়। নৈবদ্য হয় পরমান্ন।

কার্তিকের পর 'মকশির মাস' (অগ্রহায়ণ) লক্ষীর নাম, ঘরের বউ হলেন গৃহলক্ষ্মী। তিনি যেখানে থাকুন না কেন তাঁকে নিজের বাড়িতে আনতেই হবে, প্রথম বৃহস্পতিবারে ধান্য স্থাপনের জন্য। ধান্য স্থাপনের দিন লক্ষ্মীর আসনের সমস্ত পুরাতন জিনিস জলে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে সাজাতে হয়। নতুন ঘটে আম্র-পল্লব ও তার মাঝখানে একটি আস্ত কাঁচা সুপারী দিয়ে তাতে চুয়া, চন্দন, সিদুর দিয়ে সাজানোর পর মনে হয় যেন একটি ছোট্ট কচি মুখ, ঘটের সামনে তিনটি বেতের তৈরী কুনকেতে সাদা বীজ ভর্তি করে ওগুলোর উপরেও আস্ত কাঁচা সুপারি দিয়ে সাজায়। আসনের সামনে একটি নতুন চুপড়িতে সাদা ধান ভরে অনুরূপভাবে সাজিয়ে রাখে। লক্ষীর ডানদিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কল্পনা করে তিনটে গোবরের মূর্তি তৈরী করে মাথায় গুজে দেয় তিনটি ধানের শিষ। বাহিরের উঠানের দিক থেকে ঘরের চৌকাট পর্যন্ত পিটুলিগোলা জল দিয়ে কমল বনের ভিতর দিয়ে কমলার আগমনের পদ-চিহ্নের আল্পনা দেওয়া হয়, ফলমুল ইত্যাদি নৈবেদ্যাদি সহ পুজার শেষে ধান ভর্তি চুপরিটিকে গোলার ভিতরের পুরাতন ধানের চুপড়িকে বের করে তার জায়গায় নতুনটিকে স্থাপন করে। আবার যেদিন খরচের জন্য গোলা থেকে ধান বেরোবে সেদিন প্রথমে চুপড়িকে বের করে গোলার নীচে রাখে, পরে প্রয়োজন মত ধান গোলাতে থেকে বের করে নিয়ে পুনরায় ওটিকে গোলার মধ্যে যথাস্থানে রাখে ও খরচের ধান থেকে তিনমুঠো ধান তুলে নিয়ে গোলার মধ্যে ফেলে দেন। এই ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের নাম 'অগ'। অগ শব্দের অর্থ অগ্র ভাগ। বছরের প্রথম যেদিন গোলা থেকে খরচের ধান বেরোয় তাকে বলে 'মচা অনকুল'। মচা শব্দের অর্থ গোলা, অনকুল শব্দের অর্থ আরম্ভ। এককথায় গোলা থেকে প্রথম ধান বের করার দিনকে মচা অনকুল বলে। ঐদিন বাড়ির মেয়েরা নিরামিষ হবিষ্যান্ন করেন। দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে 'তরল' (পায়সান্ন) ভক্ষণ। তৃতীয় বৃহস্পতিবারে পিষ্টক ভক্ষণ ও চতুর্থ বৃহস্পতিবারে উপবাস।

মকশির মাসে নবান্ন অবশ্য করণীয়। নতুন হাঁড়িতে নতুন চাল দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে ভাত রাঁধে। নবান্ন শব্দের নব শব্দকে নবম অর্থ করে ন'রকমের তরকারী রান্না হয়। প্রথমে রান্না ঘরের ঈশান কোনে কৃষি দেবতা ঈশান-শিবের উদ্দেশ্যে একটি কলাপাতায় ভাত ও সমস্ত তরিতরকারী নিবেদন করা হয়। পরে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে দেয় নবান্ন পিণ্ড (আতপ চাল, কলা, দুধ, গুড় বা মধু, ঘৃত এই সব একত্রে গোল্লা পাকান)। ইত্যাদি কৌলিক প্রথা অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হয়। ঐদিন সাধ্যমত প্রতিবেশিদের নিমন্ত্রণ করা হয়। নবান্ন গ্রহণের পূর্বে গো-গ্রাস (একটি থালায় ভাত সাজিয়ে দিয়ে গরুকে দেওয়া।) পরে পরস্পর গুরুজনদের অনুমতি গ্রহণ করে নবান্ন গ্রহণ করা হয়।

ভাদ্র মাসে হয় অরাঁধ উৎসব। অরাঁধ শব্দের অর্থ অরন্ধন। ঘরের কোনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের দিন একটি কাঠের পিঁড়িতে আলপনা দিয়ে তার উপরে কিয়াঘড়ি (ছোট্ট কেয়াগাছ) চাপটাদল (শ্যামাজাতীয় ঘাস।) কাল কচুর গাছ, ধানগাছ, হেঁসাতি (তেশিরা ঘাস, যেগুলোতে চাটাইজাতীয় মাদুর তৈরী হয়।) বাঁশপাতা, জু-ডাল (শাঁই গাছের ডাল)। এই সাত রকমের পাতা একখানি হলদে ন্যাকড়ায় বেঁধে পিঁড়েটির উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তার পাশে রাখা হয় একটি অখণ্ড কলার ছড়া, একটি পুতা, (শিলের নড়াকে পুতা বলে।) পুতাটিকে কল্পনা করা হয় পুত্র। সামনে রাখা হয় তালপাতা আর লেখনী। বাড়ীর মেয়েরাই এই ষষ্ঠী পূজা করেন। ঐদিন উনানও জ্বলে না। উল্লিখিত সপ্তপত্রীর আর একটি ভাগ উনানের মধ্যে রেখে উনান পূজা করা হয়। আগের দিন রাতে নতুন মাটির হাঁড়িতে আতপ চালের ভাত রান্না করে। ভাতে দেওয়া হয়—কুমড়ো, লাউ, চাল-কুমড়োর খণ্ড, চালতা ইত্যাদি। অন্যান্য ফলমূল ও নৈবেদ্যের সঙ্গে পান্তার হাঁড়িও নৈবেদ্য দেওয়া হয়। উনান পূজার সময় তার চার পাশে সাতটি চালকুমড়োর পাতার উপর ঐ পান্তা ও ভাতে দেওয়া কুমড়ো লাউ ইত্যাদির এক একটু অংশ সাজিয়ে তার উপর আর একটি করে চাল কুমড়ার ফুল উপুড় করে দিতে হয়। ঐদিন মনসা পূজাও হয়।

মহাবিষুব সংক্রান্তি বা চৈত্র সংক্রান্তিকে বলা হয় আইক্ষণ। আইক্ষণ শব্দের অর্থ অয়ঃক্ষণ বা এই মুহূর্ত। ভালবাসার মাধ্যমে মুহূর্তটিকে গাছ-পালা, পশু-পাখী, আত্মীয়-স্বজন সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে নব-বর্ষের উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত হন। ভোর হতে না হতেই, বনে, বাগানে, ঝোপে-ঝাড়ে, ক্ষেতে খামারে, শুকনা ঝরা পাতা জড় করে হরিধ্বনি দিতে দিতে দেয় আগুন লাগিয়ে শস্যের অনিষ্টকারী কীট পতঙ্গ সব যায় মরে। বাঁশের ঝাড়ে গাছের গোড়ায় নতুন মাটি দেওয়া হয়। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও গভীরতায় বিঘৎখানিক একটি গর্ত করে তার মধ্যে ঘুঁটে জালিয়ে আগুন করে একটি কাষ্ঠে ফেলে দেয়। সেই উত্তপ্ত কাষ্ঠের ডগা নিয়ে ভোরের বেলা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নাভির তলায় দেয় ছেঁকিয়ে। ছেঁকানোর সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে তারা, সমস্ত স্নায়ু হয়ে ওঠে চঞ্চল, পুরাতন বৎসরের অসাড়তা যায় দূর হয়ে, হঠাৎ কোনও কঠিন ব্যাধি সহজে আক্রমণ করে না। এরপর সমস্ত গরু বাছুরকে নাইয়ে দেয়, নিজেরাও নেয়ে আসে। বুড়ো বুড়ীরা বিল্ব, অশ্বত্থ, বট, তুলসী, মনসা প্রভৃতি দেব-দেবী কল্পিত বৃক্ষগুলিতে দেওয়া হয় ঝরা। একটি ঠেঁকির (এক সের দু'সের জল ধরে, এরকম ছোট্ট ছোট্ট ভাঁড়।) তলদেশে একটি ছোট্ট ছিদ্র করে তাতে দুর্বোঘাস গুঁজে দিয়ে জল ধরে, ভর্তি করে গাছের গোড়ায় টাঙিয়ে দেয়। ফোঁটা ফোটা করে জল ঝরতে থাকে। সারা

বৈশাখ মাস ধরে ঝরায় জল দেওয়া ধর্মের কাজ এতে পুণ্য হয়। এর পরই ঘটভর্তি জল ও সরা ভর্তি যবের ছাতু দিয়ে ঘট উৎসর্গ করা হয়। ঐ পাট যাত্রা হয়। সমস্ত পূজা-পার্বণের পাট শেষ হয়। পাট যাত্রার আগের দিন নীল-শিবের পূজা হয়। একে বড় পূজা বলা হয়। মেয়েরা সমস্ত দিন নির্জলা উপোশের পর শিবের মাথায় পঞ্চামৃত ঢেলে তারপর ফলমূল ভক্ষণ করেন।

অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা মণ্ডা বা পুর-পিঠা করেন। এই পিঠার আকৃতি গোলাকার গেণ্ডুয়ার মত। তাই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা একে গেণ্ডুলি পিঠা বলে। 'থলি' ক্রেড়ে, ঐ থলি দিয়ে এক ছটাক দেড় ছটাক করে এক একটা গোল গোল ডেলা পাকায়। নারিকেল আর গুড় জল দিয়ে ছাঁই তৈরী করে। এক একটি ডেলার মধ্যে চাপ দিয়ে গর্ত করে প্রয়োজন মত ছাঁই ঢুকিয়ে মুখ করে দেয়। একে গেণ্ডুলি পিঠা বলে। তা ছাড়া নানান্ প্রকারের পুর পিঠা বানানো হয়। কোনটা সিঙ্গাড়ার মত ত্রিকোণাকার, আবার কোনটা সাতপুরী আকারের। কতগুলোর মধ্যে আবার পুর দেওয়া হয় না, পুর না দেওয়া পিঠাকে বলা হয় বাঁজ পিঠা। আবার পলাশ পাতার উপর থলি দিয়ে তার উপর আবার একটা পলাশ পাতা দিয়ে চাপা দেয়। সম্পূর্ণ পত্রাকৃতি পিঠাটিকে 'পত্তর পিঠা' বলে। অসংখ্য ছিদ্র বিশিষ্ট একটি বড় (চাল ধোয়া হাঁড়ির মত হাঁড়ির ভিতরে তার আয়তনের মাপে ছোট পাট কাঠির টুকরা পেতে দিয়ে তার উপর পিঠাগুলি সাজিয়ে দেওয়া হয়, যাতে হাঁড়ির ছিদ্রগুলি পিঠার চাপে বন্ধ না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। পিঠেগুলি হাঁড়ির মধ্যে পুরে মুখটা একটা সরা দিয়ে বন্ধ করা হয়। থাই শব্দের অর্থ ছিদ্র, এই হাঁড়িটির নাম 'থাই-হাঁড়ি'। একটি জলের হাঁড়ি উনানে বসিয়ে তলায় জাল দিতে থাকে আর এই হাঁড়ির উপরে বসিয়ে দেয় থাই-হাঁড়ি। উভয় হাঁড়ির সংযোগ স্থল আটা দিয়ে এমন ভাবে আটকে দেয় যাতে বাষ্প না বেরিয়ে যায়। আগুনের তাপে নীচের হাঁড়ির জল বাষ্প হয়ে থাই-হাঁড়ির ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে উপরের হাঁড়ির সু-সিদ্ধ করে। এই ভাবে পুর-পিঠা তৈরী হয়।

ঝুলন পূর্ণিমা বা রাখী পূর্ণিমাকে বলা হয় গো'-মা পূর্ণিমা। গোমা পূর্ণিমার দিন গোয়ালে গরু পূজার উৎসব হয়। গোবর দিয়ে গড়া হয় শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি। আর পরিয়ে দেওয়া হয় হলুদ দিয়ে রঙীন কাপড়। গরু পূজার সঙ্গে সঙ্গে এদেরও পূজা করা হয়। পূজায় অতি অবশ্যই প্রয়োজন হয় ন'নআঁনি (নাগ-নাগিনী) ফুল ও শোন ফুল। ফলমূল সাধারণ পূজার মতই। গাই-গরুর মাথায় সিঁদুর আর এড়ে গরুর মাথায় চন্দনের ফোঁটা ও শিড়ে দেয় বেণী করে সর্ষে তৈল মাখিয়ে। ঐদিন গরুকে খাওয়ান হয় আঁসকে পিঠে। পূজা অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রে। ভাইফোঁটার সঙ্গে গোমা পূর্ণিমার খুব নিকট সম্বন্ধ। এই দুটি পর্বের আদান প্রদানের ফলে আত্মীয়তার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। ভাই যদি গো-মা পূর্ণিমার দিন তত্ত্ব পাঠায় বোনের বাড়ি তবে বোনও ভাই ফোঁটার দিন ভাইয়ের বাড়ি তত্ত্ব পাঠাবে। এই সম্বন্ধে একটি বিদ্রূপাত্মক ছড়া প্রচলিত আছে।

কাঁহির কালে থিলে ভাই,
আজ আইলে গো-মা পুনাই।

ছড়াটির তাৎপর্য এই যে, সারা বছরের পূজা-পার্বনের দেখা-সাক্ষাৎ নাই, আজ কেবল গো-মা পূর্ণিমায় পাওনা-গণ্ডার বেলায় এসে হাজির। এই দিন যে সমস্ত ব্রাহ্মণ যজন-যাজন করেন তাঁরা

কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে ছেলে, বুড়া, বুড়ি সকলের হাতে রাখি বেঁধে দেন।

লক্ষীপুজা সাধারণতঃ মেয়েরাই করেন কিন্তু পৌষ-সংক্রান্তির লক্ষীপুজা মেয়েদের করণীয় নয়। পুরুষরাই এই পুজা করেন। পৌষ সংক্রান্তিকে বলা হয় মকর সংক্রান্তি। পুজার নৈবেদ্যে ঐদিন মকরের প্রাধান্যই বেশী। আতপ চাল, গুড়, কলা, রাঙালু, সাঁকালু, নারিকেল, আদা ইত্যাদির সংমিশ্রণকে মকর বলে। অনেক সময় আতপ চালের পরিবর্তে চিড়া ব্যবহার করা হয়। উত্তরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে দিবামানের বৃদ্ধি শুরু হলেও 'মকর খেলে চকর বাড়ে', এই কথাটি প্রচলিত আছে। পৌষ-সংক্রান্তি না গেলে মকর না খেলে যেন দিবামাণ বড় হবে না, এই ধারণা। খামারকে বলে 'খোলা'। এই জন্য এর আর এক নাম 'খোলা-পুজা'। উৎসবান্তে পাড়া-প্রতিবেশী সকলের বাড়ীতে মকর বিতরণ করা হয়। ঘর-দোর খামার-উঠোন সবই ঐদিন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে আল্পনা দেওয়া হয়। মেহির গোড়ায়ও ধামা, কুলো, কুনকে প্রভৃতি ধান মাপা বা পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজন হয় সেগুলো যে যার আল্পনার উপর রাখা হয়। আর মেহীর গায় ঠেসান দিয়ে বেঁধে দেয় 'শুক্রবাড়ী' ও 'ক্ষেত-গুড়ানী'। প্রথম ধান্য ছেদনের দিন আড়াই মুঠো ধানগাছ দিয়ে যে আঁটি বাঁধা হয় তাকে বলে 'শুক্রবাড়ী'। ধান্য ছেদনের শেষের দিন, আড়াই গোছ ধানগাছ দিয়ে যে আঁটি বাঁধা হয় তাকে বলে 'ক্ষেত-গুড়ানী'। লোকে বলে এইভাবে ধান্য ছেদন আরম্ভ ও শেষ করেছিলেন 'ভীম'। অন্যান্য পুজারীর মত পুজক 'গৃহ-কর্তা' ভাত না খেয়ে সেদিন ফল-মূল খান্। খোলা পুজার এইসব উদ্যোগ সন্ধ্যার পূর্বে ঠিক করে রাখে।

এই সমস্ত পুজার আয়োজন লক্ষীপুজার মত এবং এই পুজাকে পৌষ সংক্রান্তি মকর সংক্রান্তির লক্ষীপুজা বলা হলেও পুজারী কিন্তু প্রথমে লক্ষীপুজা না করে শেয়াল (শিবা) পুজার জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করেন, কখন শেয়াল ডাকবে। শেয়াল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি করেন মহিলারা, আর পুজক গঙ্গাজলের ঘটি নিয়ে ছড়া ফেলতে ফেলতে মেহীকে কেন্দ্র করে সাত পাক ঘোরেন বৃত্ত-রেখার উপর। এইভাবে তিনবার শেয়াল ডাকার প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। প্রবাদ আছে যেদিকে প্রথম শেয়াল ডাকে সেই দিকেই ধান ভাল হয়। ঐদিন শেয়াল অত্যন্ত বরেণ্য দেবতা। পাছে তার সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় তাই সারাদিন তার নাম ধরে ডাকে না, বলে 'সার ডাকছে'। গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে ঐভাবে পাক খাওয়াকে বলা হয় 'সার ধরা'। সার ধরার পরে বাসুয়া পুজা ও শেষে লক্ষীপুজা। লক্ষী পুজার পর আরম্ভ হয় কৌতুকপ্রদ ধান মাপা। পুজার পূর্বে কিছু সাদা ধান জড় করে রাখা হয়, ধান মাপার জন্য ধামা, কাঠা, কুনকে প্রভৃতি যে সমস্ত মাপক বস্তু সেখানে থাকে ঐগুলো দিয়ে ধান মাপ করতে শুরু করে দেন পুজক। মালকোঁচা মেরে ডান হাঁটুটা মাটিতে গেড়ে, বাম হাঁটুটা বুকের কাছে রেখে, ভীমের আসন অনুকরণে চলে মাপ। কাঠা, কুনকে, ধামা প্রভৃতি মাপক বস্তুগুলিকে উবুড় করে ঐ পেছন দিক দিয়ে দু'বার করে মেপে মাপক পাত্র সহ ধান মেহীর দিকে ফেলে দেয়। এক এক বারের মাপকে গোনে 'এক কুড়ি', 'দুই বিশি' ইত্যাদি। ছোট ছোট ধামাকে কাঠা বলে। এক কাঠায় পাঁচ সের ধান ধরে। ষোল কাঠাতে এক কুড়ি হয়। কুড়ি কুড়িতে এক 'বিশি'। মাপক যন্ত্র সহ ধান খোলায় পড়ে থাকে সেই রাতটা। এইভাবে শেষ হয় খোলা পুজা। তারপর পাড়া-পড়শী সবাইকে মকর বাঁটা হয়।

আন্তর্জাতিক আইনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

যদিও আন্তর্জাতিক আইন বর্তমান সময়েই এমনভাবে পল্লবে পুষ্পে পরিপূর্ণ হয়ে সুগঠিত হয়ে উঠেছে তথাপি এর উৎস অনুসন্ধান করতে হবে ফেলে আসা এক অতীত যুগে। এর উদ্ভবের কাল দূরবর্তী হয়েছে আজ থেকে ২০০০ হাজার বছর আগে। ইহুদীরা সন্ধি পালনের আইন সৃষ্টি করেছিলেন এবং রাজদূতের প্রতি তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ইহুদীরা তাঁদের দেশে বহিরাগত এবং নিজেদের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে এই রকম আইন কানুন প্রয়োগ করতেন। তাঁরা বলতেন, 'বিদেশীদের ভালোবাসো, কেন না বিশ্বময় ভূখণ্ডে তোমরাও বিদেশী ছিলে।'

হিন্দুরা বিষাক্ত এবং মারণাস্ত্র ব্যবহার থেকে অতীতকালেই বিরত ছিলেন। আত্মসমর্পণকারী বা আহত ব্যক্তিকে তাঁরা আক্রমণ করা বা হত্যা করাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। শরণাগতের প্রতি তাঁদের চিরকালই ছিল এক গভীর কর্তব্য বোধ। যুদ্ধের বন্দীদের এবং অসামরিক ব্যক্তিদের হিন্দুরা গভীর মর্যাদা দেখাতেন। রাজদূতকে অত্যন্ত সমাদর করতেন। তাঁরই মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আদান প্রদান চালু রাখতেন। সন্ধিগুলির উপর গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাঁদের। সন্ধির সর্তগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা।

ইসলামের জন্ম মুসলিম রাষ্ট্রগুলি অমুসলিম রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করাকে তাদের অধিকার বলে মনে করতো। অমুসলিম রাষ্ট্রগুলি ইসলাম ধর্মগ্রন্থকে অস্বীকার করলেই তাদের বিরুদ্ধে শুরু হতো জেহাদ। কিন্তু এই জেহাদের সময়ই শিশু, বৃদ্ধ এবং মুমূর্ষদের রক্ষা করবার রীতি যে বর্তমান ছিল তা' ক্রুশেডের ইতিহাস যারাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করবেন তারাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। অবশ্য এই জেহাদে বন্দীদের হত্যা করা হতো কিংবা ক্রীতদাসেও পরিণত করা হতো।

গ্রীকরা ভালোমন্দ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিধানকেই মেনে চলতেন। অঘোষিত যুদ্ধে তাদের বরাবরই অনীহা ছিল। যুদ্ধের বন্দীদের তারা ক্রীতদাস করতেন / অথবা নিজেদেরই ভৃত্যে পরিণত করতেন। তবু যারা চাহিদা অনুযায়ী অর্থ দান করতে পারেন তাদের মুক্তিও দেওয়া হতো। তারা চিরকালই মন্দির ও ধর্মস্থানগুলিকে সুগভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে এসেছেন। যাজক, পুরোহিত কিংবা কোন ধার্মিক ব্যক্তি শত্রুদলের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার উপরে কোন প্রকারের আঘাত হানা হতো না। আন্তঃরাজ্যের কলহ সালিশীর জন্য সুপারিশ করা হতো। সন্ধি সংগঠন ও পূর্ব বিবেচনায় রীতি প্রচলিত ছিল এবং তার শর্তগুলিকে যথার্থ মর্যাদাও দেওয়া হতো। রাজদূত বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। গ্রীক ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই একথা একবাক্যে স্বীকার করবেন।

রোমান সাম্রাজ্যের ২০ জন পুরোহিত বা 'ফেটিয়ালিস্' নিযুক্ত ছিলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার জন্য। প্রাচীন রোমে 'জাস জেনটিয়াম' বিধি ছিল রোম ও অন্যান্য দেশ ও বিদেশীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের সংহিতা। গ্রীকদের মতন রোমানরাও পূর্ব ঘোষণার দ্বারা যুদ্ধ

ঘোষণা করতেন। অতর্কিত আক্রমণ তারাও ঘৃণার চোখে দেখতেন। কোন মৈত্রী চুক্তি, আত্মসমর্পণ বা বিজয়ের মধ্যেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটতো। যদি কোন দেশ আত্মসমর্পণ করতো তবে সেই দেশের কোনরূপ সম্পত্তি গ্রহণ বা জনক্ষয় করাকে প্রথাসিদ্ধ বলে কখনোই মনে করতেন না রোমানরা। কিন্তু বিজিত দেশের জননিরক্ষণ বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সম্পর্কে কোন বিধি বা আইন ছিল না। তিন রকমের সন্ধিতে তাঁরা স্বাক্ষর করতেন—মৈত্রী সন্ধি, আঁতাতের সন্ধি ও আতিথ্যের সন্ধি। কোন সন্ধিকে অগ্রাহ্য অথবা বাতিল করতে হলেও পূর্বেকার ঘোষণার প্রয়োজন হতো। রোমানদের এই বৈদেশিক সম্পর্ক সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থা (২০ জন পুরোহিত) এবং নানাবিধ রীতিনীতি বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনকে গড়ে উঠতে অনিবার্যরূপে সহায়তা করেছে সন্দেহ নেই। সুসভ্য রোমই হলো অনাগতকালের সকল উদ্ভবের স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণ যার অনুপ্রেরণায় ইতিহাসের পর্বে পর্বে মানুষের প্রয়োজনের স্বর্ণগর্ভ ফসলের ক্ষেত নির্মিত হয়েছে।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, আন্তর্জাতিক আইন তার গঠনের পথে তিনটি স্তর অতিক্রম করে এসেছে। প্রথম স্তরের সূচনা আদিমতম দিন থেকে, শেষ খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ায়। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হলো রাষ্ট্রগুলি একে অন্যকে তখনই আনুগত্য জানিয়েছে যখন সম্পর্কিত রাষ্ট্রসমূহের জাতিগুলিও এক থেকেছে। যতদূর জানা যায়, দ্বিতীয় স্তরের সূচনা প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিকে। সমাপ্তি ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কারের সময়। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হলো সম্পর্কিত রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করেছে একজন 'সাধারণ ঐক্যবিধায়ক।' তিনি এই রাষ্ট্রগুলি সকলের দৃষ্টিতেই, তাঁর উদার ও নিরপেক্ষ মনোভাবের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হয়েছেন। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পোপ এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পবিত্র রোমান সম্রাট (অস্থায়ী ক্ষেত্রে) এই শ্রেষ্ঠত্বের পদে সমাসীন ছিলেন। তৃতীয় স্তরের সূত্রপাত রোমান সাম্রাজ্যের সংস্কার আন্দোলনেরই গোড়ার দিকে এবং আজ পর্যন্তও তা' অব্যাহত। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হলো সম্পর্কিত রাষ্ট্রসমূহ তাদের এক বৃহৎ সমাজের অংশ বলে মনে করে এবং তাদের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য আছে বলে স্বীকার করে থাকে। বলা যেতে পারে তৃতীয় স্তরের চেতনাতেই নিহিত ছিল বর্তমানের লীগ অফ নেশানস ও জাতিসংঘের অংকুর।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে অনেক বিষয়ই আন্তর্জাতিক আইনকে গড়ে উঠতে সহায়তা করেছে। মহাকালের উজানে, উচ্ছ্বাসে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে গেছে। লুপ্ত হয়েছে সকল খ্রীষ্টীয় রাজ্যের ঐক্যমত। তার ফলে একাধিক রাষ্ট্র আপন আপন স্বাধিকারে প্রমত্ত হয়ে অন্তত্ব লাভ করেছে। তারা প্রত্যেকেই স্থায়ী সৈন্যদল মোতায়েন রাখতে উৎসুক। বিভিন্ন সংস্থা সুগঠিত হয়েছে। ব্যবসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নানা ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পাকাপাকি-ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এসবের জন্যই প্রয়োজন হয়েছে সব আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ। তারপরই উপস্থিত হয়েছেন বিচারক মণ্ডলী। যতদূর জানা যায়, আন্তর্জাতিক আইন সংগঠন ও সংরক্ষণের কাজে প্রথম যিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নাম হলো জেন্টিলেস। জেন্টিলেস ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর অক্সফোর্ডের একজন পৌর আইনের অধ্যাপক। বিশিষ্ট আইনবিদ ও চিন্তানায়ক স্টার্কের মতে, তারপর যিনি এলেন অর্থাৎ সেই বিশ্রুত চিন্তানায়ক হুগো গ্রোটিয়াস, তিনিই হলেন প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক আইনের প্রথম দিক দিশারী। আন্তর্জাতিক আইনের

ইতিহাসে তাঁর চিরস্থায়ী প্রভাব অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করলো হুগো গ্রোটিয়াসের প্রখ্যাত গ্রন্থ 'সংগ্রাম ও শান্তির আইন।' এই গ্রন্থখানি থেকেই ধারাবদ্ধভাবে একটা আন্তর্জাতিক আইনের দিক নির্দেশিত হলো।

তিরিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটলো ওয়েস্টফেলিয়ার শান্তিচুক্তির ফলে। যুদ্ধে যারা পরাজিত হলো, তারা হলো পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য, ক্যাথলিক চার্চ ও স্পেন। জয়লাভ করলো ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। এর ফলে রোমান সম্রাট ও ক্যাথলিক চার্চের একাধিপত্য ক্ষুণ্ণ হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একাধিক চুক্তি ও বাণিজ্য সম্পর্ক সংঘটিত হলো। এই সকল সন্ধি, চুক্তি ও পারস্পরিক সম্পর্কই ত্বরান্বিত করে দিল আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশকে। তাই কোন কোন আইনবিদের মতে, আজকে আন্তর্জাতিক আইন বলতে আমরা যা' বুঝি তার প্রথম সুসংগত উল্লেখ নাকি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে করেছিলেন জার্সি বেনথাম। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, অষ্টাদশ শতকের শেষাধেই আন্তর্জাতিক আইনকে এক সুসংগত পরিণতি দেবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়।

যা হোক্। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তেমন কোন ঝড় ঝাপটা দেখা গেল না। কেবল এই সময় একটা পার্থক্য নির্ণয় করা হলো বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার বিষয়ে। নিরপেক্ষ শক্তি সম্পর্কে যে আইন অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে, এই সময়ে তা দানা বেঁধে উঠলো। একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধে। প্রাকৃতিক আইনের সমর্থকদের যিনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তিনি হলেন সামুয়েল প্রফেনড্রুক। তাঁর মতে, রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের প্রতি তাদের স্বাভাবিক ব্যবহার স্বাভাবিক কারণেই করতে বাধ্য কেন না তাদের কোন সাধারণ শ্রেষ্ঠ নিয়ামক নেই। প্রফেনড্রুকের সমর্থকদের বলা হতো প্রকৃতিবাদী। প্রকৃতিবাদীদের বিরোধিতা করতে আর এক গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন। এরা অস্বীকার করলেন প্রাকৃতিক আইনের অস্তিত্বকে। বললেন, আন্তর্জাতিক আইনও উদ্ভূত হয়েছে আচার আচরণ ও পারস্পরিক সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি থেকে। এরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রত্যক্ষবাদী গোষ্ঠী বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত হলেন। এই গোষ্ঠীর পুরোধা ছিলেন বাইনকারশোয়েক ও জন জ্যাকব মোসার। আর একটি গোষ্ঠীও ছিলেন যাদের বলা হতো গ্রোটিয়পন্থী। এরা আন্তর্জাতিক আইনের উদ্ভবের ব্যাপারে এক মাঝামাঝি মত মেনে চলতেন। এদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন যথাক্রমে ক্রিশ্চিয়াল উলফ্ এবং এমারিক দ্য ভ্যাটেল। বলা যেতে পারে প্রথম ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণেই আইন নিয়ে রীতিমত চিন্তা শুরু হয়ে গেছে। ১৭৮৯/৯৯ ঘটে গেল ফরাসী বিপ্লব। মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো তাতে। প্রজাসাধারণ সম্পর্কে সকল রাষ্ট্রের চিন্তাধারা পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করলো এই বিপ্লব। এই শতাব্দীতেই সমস্ত বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সন্ধিসমূহের কালানুক্রমিক ও বিধিবদ্ধ সংরক্ষণ শুরু হলো। তারপর এলো এক সময় উনবিংশ শতাব্দীর স্বর্ণ প্রভাত।

উনবিংশ শতাব্দীতে একাধিক নোতুন রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান, আন্তঃসাগরের বুকে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রসার, যানবাহনের ক্রমোন্নতি আন্তর্জাতিক আইনের প্রগতিকেও পথ দেখালো। আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে নানা পুরস্কার প্রদান করেছেন বারবার এবং বারবার আইন প্রণয়নকারী সন্ধিসমূহ সংস্থাপিত হয়েছে। ১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো ভিয়েনা কংগ্রেস। এই কংগ্রেসের চেষ্টা

ছিল জাতি সমূহের বিধিবিধানকে পারস্পরিক ক্ষেত্রে মেনে চলার পথ নির্দেশ। বলা যেতে পারে এই কংগ্রেসই হলো সর্বপ্রথম ইউরোপীয় জাতি সমূহের আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এখানেই ঠিক করা হয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জলপথে বাণিজ্য ও যাতায়াতের নিয়ম কানুন। ১৮৫৬ সালে প্যারিসের ঘোষণা সমুদ্রপথে যুদ্ধের একাধিক ধারাকে সংকলিত করেছে। ১৮৬৪ এবং ১৯০৬-এর জেনেভা সম্মেলনদ্বয় স্থলপথ ও জলপথের যুদ্ধে অসুস্থ এবং আহতের সম্পর্কে অনেক বিবেচ্যবিষয় লিপিবদ্ধ করেছে। ১৮৬৮ সালের সেণ্ট পিটার্সবুর্গের ঘোষণায় যুদ্ধে বিস্ফোরক বুলেটের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। অতঃপর প্রত্যক্ষবাদী আন্তর্জাতিক আইন বিশারদ ডু মারটিনস, হেফটার; ফিল্লিমোর; সেইন এবং ওয়েস্টলেক প্রমুখ লেখকদের জনকল্যাণমূলক মতামতের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করা হয়। হল, ওপেনহিয়েম, লরেন্স, হাইড, হুইটন, এবং ব্লুন্টশ্লি প্রমুখ লেখকদের লেখাও আন্তর্জাতিক আইনের গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ১৮৯৯ সালের হেগ সম্মেলনেও স্থলযুদ্ধের আইনকানুন স্থির করা হয়। ১৯০৭ সালের দ্বিতীয় হেগ সম্মেলনে বোম ফাটানো সম্পর্কে অনেক, বিধিনিষেধ নির্দ্ধারিত হয়। নিরস্ত্র জনতাও নিরপেক্ষ শক্তির উপরে যুদ্ধকালীন কোন আঘাত হানা সম্পর্কেও আইনকানুন লিপিবদ্ধ হয় হেগ সম্মেলনে। হেগ সম্মেলনেই একটি চিরস্থায়ী সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯১৪-১৮র বিশ্বযুদ্ধে দেখা গেল যে বারবার আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধগুলি লঙ্ঘিত হলো। তাই যুদ্ধের শেষেই আন্তর্জাতিক আইনকে শক্তিশালী করে গঠন করার কথা চিন্তা করতে হলো। ১৯১৯ সালে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হলো এবং তাতে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ২৮শে জুন ১৯১৯ সালেই গঠিত হলো জাতিসংঘ (লীগ অফ নেশানস্), ১৯২০ সালেই গঠিত হলো চিরস্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়। ১৯২৫ সালের ১৬ই নভেম্বর সংগঠিত হলো লোকার্না চুক্তি। এই চুক্তিতেই শান্তিপূর্ণভাবে কলহ নিষ্পত্তির বিষয়সমূহ গৃহীত হয়। বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়টিকে ব্রিটেন ও ইটালী মেনে নেয়। কিলোস ব্রায়ান্ড চুক্তি অথবা ১৯২৮ এর প্যারিস চুক্তি জাতীয় নীতিরূপে যুদ্ধকে ধিক্কার হানে। চুক্তিবদ্ধ জাতিসমূহ শান্তিপূর্ণভাবেই সকল আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ঐক্যমত হয়। ১৯২৯ সালের জেনেভা বৈঠক আন্তর্জাতিক আইন গঠনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই চুক্তির ফলে প্রতিশোধ গ্রহণ, যুদ্ধ বন্দীদের উপরে নির্দয় ব্যবহার, কোন একজন ব্যক্তির দোষে সমষ্টির উপরে আঘাত হানা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিষিদ্ধ হয়। এতেই ঠিক হয় যে চিকিৎসক সংস্থা ও আহত ব্যক্তিদের শুশ্রূষাকারী দলকে অনাক্রম্যতা দান করতে হবে। উপরন্তু এও ঠিক হয় যে যুদ্ধে হতাহত ব্যক্তিদের এবং যুদ্ধ বন্দীদের উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে হবে। বলাই বাহুল্য জাতি সংঘের প্রতিষ্ঠার পরই আন্তর্জাতিক আইনের অনেক রীতি নীতিকে বিধি বদ্ধ করা হয়। ইতিস্তত বিক্ষিপ্ত অনেক বিধিবিধান, আচার নীতি ও প্রস্তাব সমূহ আইন আকারে লিপিবদ্ধ হবার উদ্যোগ দেখা দেয়।

কিন্তু ১৯৩৯-৪৫ সালের মহাযুদ্ধ ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করে আন্তর্জাতিক আইনের বিধি। বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও চিন্তানায়করা প্রমাদ গোণেন। উপলব্ধি করেন যে জাতি সংঘ আন্তর্জাতিক

সম্পর্ককে স্থির রেখে ঝড়ের কেন্দ্রকে শান্ত রাখতে পারেন নি। তাই যুদ্ধান্তে ১৯৪৫ সালের ২৬ শে জুনই স্যানফ্রানসিসকোতে ৫০টি রাষ্ট্র মিলে এক সনদে সই করলো। ঐ বছরই ২৪ শে অক্টোবর সম্মিলিত জাতি সংঘ বা ইউ, এন ও পৃথিবীর আলোর মুখ দেখলো। ১৯৪৬ সালে আন্তর্জাতিক স্থায়ী বিচারালয়ের অপসারণ ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হলো আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের। ১৯৪৮ সালে মানবিক অধিকারের নিখিল ঘোষণা গৃহীত হলো। ১৯৫০ সালে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষায় ইউরোপীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মোটকথা, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উত্তাল তরঙ্গ সমস্ত পৃথিবীতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে। ১৯৫০ সালের ৩রা নভেম্বর পুনরায় গৃহীত হয় সম্মিলিত জাতি সংঘ কর্তৃক শান্তির স্বপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রতিজ্ঞা। মোটকথা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সংগঠিত হতে চলেছে। সংগঠিত হয়েছে। হচ্ছে এবং আগামী ভবিষ্যতে হবে বলেই আশা করবো।

মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক আইন অবশ্যই লঙ্ঘিত হয়েছে। হচ্ছে। পৌর আইনও লঙ্ঘিত হয়। জেনে না জেনে নানান ভাবেই মানুষ আইনকে লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। সকল সময় অপরাধ প্রবণ মন থেকেই যে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়, এ কথা সত্য নয়। শতাব্দীভর মানুষের যে শুভাকাঙ্ক্ষা অতন্দ্রজনীর পরিশ্রম দিয়ে আন্তর্জাতিক আইনকে সংগঠিত করেছে সেই কোন শৈশবকাল থেকে তাতে সে আজ যৌবন প্রাপ্ত হয় নি, এ কথা বলা মানে সত্যেরই অপলাপ। রাষ্ট্রসমূহ ক্রমশই চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে; স্থানে স্থানে কালে কালে গড়ে তুলছে শিক্ষা সংস্কৃতি বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে যে পারস্পরিক আদান প্রদানের সংস্থা ও শিবিরগুলি তা দেখেও কি উৎসাহ বোধ করবো না? নাকি দিগন্তে সহসা ঘনায়মান মেঘমালা দেখেই মনে করবো আর সূর্যোদয়ের কোনই আশা নেই? সমস্ত বিশ্বই বুঝি তার প্রাণসম্পদে দেউলে হয়ে গেছে? এর থেকে আর নিষ্ঠুর মনোবিকার কিছুই হতে পারে না।

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

সমালোচনা

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্মরণিকা—সম্পাদক : রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। সাহিত্য তীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। ছয় টাকা।

কবি নরেন্দ্র দেব স্মরণিকা—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক সম্পাদিত। সাহিত্য তীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। পাঁচ টাকা।

কবি কুমুদরঞ্জন ছিলেন খাঁটি মানুষ, তাঁর জীবন ছিল, সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। আর এই সারল্য ছিল মহিমা ও মাধুর্যে মণ্ডিত। তাঁর কবিতাতে তাঁর এই পরিচয়ই আমরা পাই এবং তাঁর কবিতার প্রকৃতিও এই। তাঁর নিজের ভাষাতে কবির সম্বন্ধে বলতে পারি—'লোকটা ছিল খাসা'। তাঁর কবিতায় নানা রস তরঙ্গায়িত হলেও যে রস সব চেয়ে বেশী উৎসারিত সেটি শান্তরস। এইখানে ওয়র্ডসোয়র্থের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সাদৃশ্য চোখে পড়ে, যে ওয়র্ডসোয়র্থের কবিতা ছাত্রাবস্থায় কুমুদরঞ্জনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ওয়র্ডসোয়র্থ কাব্যের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—ভাবাবেগ শান্তিতে সমাহিত হলে কাব্যের উৎপত্তি। এ কথা সব কবির কাব্য সম্বন্ধে বলা চলে না কিন্তু ওয়র্ডসোয়র্থ ও কুমুদরঞ্জনের কাব্য সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য। কবিশেখর কালিদাস রায় তাই কুমুদরঞ্জনের সহজিয়া রচনাভঙ্গিকে 'অদ্ভুত, সুকুমার, শান্ততচি, স্নিগ্ধ ও কমনীয়' বলে বর্ণনা করেছেন।

কুমুদরঞ্জনের মৃত্যুর দু বছর পরে প্রকাশিত 'কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্মরণিকা' কবির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি কারণ এই সংকলনেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য এর 'অদ্ভুত' ও 'সুকুমার' ভাব। এই গ্রন্থে মহাকাব্যের বিরাটত্ব ও গাম্ভীর্য না থাকলেও উদ্ভট শ্লোকের স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্য আছে, যেটা কুমুদরঞ্জন রিক্ষ গাড়ীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন—'সহজিয়া চায় পথ সহজ সরল'।

'স্মরণিকা'—সম্পর্কে সম্পাদক শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক লিখেছেন—'কুমুদরঞ্জনের কবিজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের চিত্র ও চরিত্র নানাজনের নানাদিকের দৃষ্টিতে ধরা রয়েছে তারই যতটা সম্ভব সংকলন আলোচ্য স্মরণিকায় সংগৃহীত হল।' এইসব আলোচনা যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে বহু বিশিষ্ট নাম রয়েছে। কয়েকজন বিশিষ্ট কবির কুমুদরঞ্জন সম্পর্কিত কবিতাও সংযোজিত হয়েছে। প্রায় সব কটি লেখার মধ্যেই কবির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতির পূর্ণ প্রকাশ রয়েছে। সাহিত্য-সমালোচনার দিক থেকে কয়েকটি লেখা গুরুত্বপূর্ণ। সম্পাদক-রচিত 'কবি কুমুদরঞ্জন ও তাঁর কাব্যচৈতন্য' প্রবন্ধটির এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

নরেন্দ্রদেব তাঁর নিবন্ধে কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও কুমুদরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থের কবিতা নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। শ্রীকালিদাস রায় কুমুদরঞ্জনকে তাঁর উপগুরু-রূপে বর্ণনা করেছেন (রবীন্দ্রনাথ গুরু)। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কুমুদরঞ্জনকে 'অন্যতম শেষ প্রাচীন কবি' মনে করেন। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজের ও কবি নজরুলের সঙ্গে কুমুদরঞ্জনের সম্পর্ক

আলোচনা করেছেন। ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কবির রচনারীতির সব থেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কবিতায় উপমামালা প্রয়োগ। শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'কুমুদ-তীর্থে' রচনায় 'ভাব-পাগল, আত্মভোলা' কবি ও তাঁর গৃহস্থালীর সুন্দর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে।

এইসব লেখা ছাড়াও বহু মূল্যবান রচনার সমাবেশ ঘটেছে 'স্মরণিকা'তে যে গুলিতে স্মৃতিচারণের পাশাপাশি রয়েছে কাব্যবিচার। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রার্থনা করি' পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কবিপুত্র শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক কুমুদরঞ্জনের রচনায় কিপলিঙের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কবির দিনলিপির কিছু অংশ আমাদের উপহার দিয়েছেন। কুমুদরঞ্জনের একটি গ্রন্থপঞ্জীও সংযোজিত হয়েছে। কবির বহু চিঠিপত্র এবং কয়েকটি আলোকচিত্র স্মরণিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিন্তু এগুলির সবগুলি মুদ্রিত না করে কিছু চিঠি ও ছবি বিশেষভাবে নির্বাচিত করে দিলে ভালো হত। কবির দিনলিপির সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। একই বিষয়ের বারংবার পুনরাবৃত্তি ও পুনরুক্তি সংকলিত নিবন্ধগুলির মধ্যে দেখা যায়। এ ব্যাপারে একটু সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল। যে দু-একটি রচনাতে কুমুদরঞ্জনের চেয়ে রচনার লেখক নিজে অনেক বড় হয়ে উঠেছেন সে রচনাগুলি বর্জন করলে, এবং মুদ্রণশুদ্ধির দিকে আর একটু দৃষ্টি রাখলে, 'স্মরণিকা' সুন্দরতর হতে পারত। তবে এই সব সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাপিয়ে যেটা আমাদের প্রশংসা আকর্ষণ সেটা সকলন-গ্রন্থের সযত্ন ও সশ্রদ্ধ সম্পাদনা। পাতায় পাতায় পরিচ্ছন্নতা ও সুরুচি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুই শতাধিক পৃষ্ঠার এই সুন্দর এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থটির পরিবেশনার জন্য সাহিত্যতীর্থ—কুমুদরঞ্জন এক সময় এই প্রতিষ্ঠানের তীর্থপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন—সকলের ধন্যবাদ অর্জন করবেন।

সারা জীবন কবি নরেন্দ্র দেব জীবনের খেলাঘরে খেলেছেন, খেলেছেন প্রকৃত খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়ে। জেতা বা হারা তাঁর কাছে বড় কথা ছিল না, খেলাটাই ছিল আসল। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি লিখেছিলেন—'এগিয়ে আসে যাবার বেলা'। খেলাভাঙার খেলার কথা তখন তাঁর মনে। তাই তিনি লিখলেন—'এবার তবে গুটোও পাশা সাঙ্গর করে দাও হে খেলা'। তিনি ছিলেন নিতান্ত নিরভিমানী, না হলে ল্যাণ্ডর-এর মতো লিখতে পারতেন—

I strove with none ; for none was worth my strife ;
Nature I loved, and, next to Nature, Art ;
I warmed both hands before the fire of life ;
It sinks and I am ready to depart.

ল্যাণ্ডর ব্যক্তিগত জীবনে অনেক বাদ-বিসংবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র দেব ছিলেন অজাতশত্রু। জীবনের আলো নিবে আসছে দেখে তিনি বিমর্ষ হয়ে উঠেছিলেন, অভিভূত হয়ে পড়েন নি—'সন্ধ্যাবেলা আমার ঘরে নামছে এখন অন্ধকার।' তখন বিহঙ্গের যাবার সময় আগতপ্রায় কুলায় রিক্ত হতে দেরী নেই।

নরেন্দ্র দেব বঙ্গের বিদগ্ধ-সমাজে একটি প্রিয় নাম। সাহিত্যিক রূপে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু তার চেয়ে বেশী যেটা অর্জন করেছিলেন সেটা ছোটো-বড় সকলের অকুণ্ঠ

ভালোবাসা। তিনি নিজেও ছিলেন স্নেহপরায়ণ, সকলকে আপনার করে নিতে পারতেন। সহধর্মিণী শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে নিয়ে তিনি যে সুখনীড় রচনা করেছিলেন, তার নামকরণ করেছিলেন 'ভালোবাসা'। এই নামকরণ সার্থক, কারণ আজীবন তিনি, রবার্ট ব্রাউনিঙের মতো, ভালোবাসারই সাধনা করে গেছেন।

সাহিত্যতীর্থ প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় তীর্থপতি নরেন্দ্র দেবের মৃত্যুর পরে তাঁর গুণমুগ্ধ সাহিত্যিকেরা তাঁর সম্বন্ধে যে সব স্মৃতিচারণা করেছেন সেগুলিকে একটি সুন্দর ও সুসম্পাদিত রূপ দিয়েছেন শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক। তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তিনি আরম্ভ করেছেন এই ভাবে—'পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যপ্রাণ সহৃদয় সামাজিক পুরুষ ছিলেন কবি নরেন্দ্র দেব।' 'স্মরণিকা'র পাতায় পাতায় নরেন্দ্র দেবের সাহিত্যনিষ্ঠা, সহৃদয়তা ও সামাজিকতা পরিস্ফুট। তাঁর অনুরাগী সত্তা বনফুলের 'নরেনদা—আমাদের নরেনদা' কবিতায় উজ্জ্বল—

নরেনদা চলে গেলেন : সারা জীবন একটি কথাই বলে গেলেন—'ভালোবাসি,/ভালোবাসি তোমাদের হাসি/তোমাদের আনন্দ/তোমাদের মুক্ত-প্রাণের ছন্দ।'

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলিতেও নরেনদার এই দিকটির কথা বলেছেন, কারণ তিনি ছিলেন, প্রকৃত অর্থে সকলের নরেনদা। তাঁকে সহজেই জলধর সেনের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

'স্মরণিকা'তে বহু খ্যাতনামা লেখক কবিতা ও অন্যান্য রচনার মাধ্যমে নরেনদাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা-উদারতার বহু কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে নরেনদার কি সম্পর্ক ছিল এবং নরেনদার কাছে তাঁরা কতভাবে উপকৃত তাও তাঁরা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। গ্রন্থটিতে নরেন্দ্র দেবের নিজের লেখাও কিছু কিছু সংযোজিত হয়েছে, তার সঙ্গে বহু আলোকচিত্র। শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর কয়েকটি সুরচিত কবিতা রয়েছে, সেগুলিতে তাঁর শোকগ্রস্থ হৃদয়ের বেদনা উন্মথিত—

আবার সমুদ্র এলো দুজনার মাঝে।
এপারে ওপারে দুটি বিচ্ছিন্ন হৃদয়।
কুটিল কল্লোলে নাচে অপার সময়—
মনে হয়, এ সময় শেষ হবে না যে।

কবিকন্যা শ্রীমতী নবীনতা দেব সেন লিখেছেন 'পিতৃস্মৃতি'। গ্রন্থশেষে 'নরেন্দ্র দেব গ্রন্থপঞ্জী' দেওয়া হয়েছে।

সাহিত্যের বহু বিভাগে নরেন্দ্র দেবের দান রয়েছে, অনুবাদের ক্ষেত্রে তো বিশেষভাবে। পত্রিকা সম্পাদনেও তিনি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'স্মরণিকা' গ্রন্থটিতে কিন্তু নরেন্দ্র দেবের সাহিত্যের মূল্যায়ণের কোনো প্রচেষ্টা চোখে পড়ল না। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা থেকে অবশ্য এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে—'নরেনদা কত বড় মানুষ ছিলেন সবিস্ময় এ উপলব্ধির পাশে তিনি কত বড় সাহিত্যিক ছিলেন, সে বিচার তুচ্ছ হয়ে গেছে।' আশাকরি 'স্মরণিকা'র দ্বিতীয় সংস্করণে নরেন্দ্র দেবের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

O F-1-68

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

যুক্তিবাদ আধুনিকতা ও আনন্দ মীমাংসা ৩·৭৫ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্র-সুভাষিত ১২·০০ রবীন্দ্র রচনার উদ্ধৃতিসম্ভার
দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী ৫·৫০ ৺ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব ৮·০০ ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
ছো ডান্স অব্ পুরুলিয়া ১০·০০ ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য
শিব-ভাবনা ৯·৫০ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
টেন স্কুলস্ অফ বেদান্ত (পার্ট ১) ৬·০০ ডক্টর রমা চৌধুরী
রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী ১০·০০ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
ভারতপুত রবীন্দ্রনাথ ৪·৭৫ ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারত লোকনাট্য-সমীক্ষা ১৬·৫০ ডক্টর গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
সংগীতরত্নাকর ১৮·০০ শার্ঙ্গদেব সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-অনূদিত
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু ৬·০০ ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ
এনালিটিকাল স্টাডি অব্ ফোর মিকাস্ ৩৭·৫০ দীপককুমার বড়ুয়া
রিফর্ম এণ্ড রিজেনারেসন ইন বেঙ্গল ১৬·৫০ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
রবীভারতী পত্রিকা। প্রতিসংখ্যা ১·০০ সম্পাদক রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

রবীভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭